ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬২ বর্ষ ২৩ সংখ্যা ।। ১৮ মাঘ, ১৪১৬ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১১) ১ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ ।। Website : www.eswastika.com

সন্ত্রাসবাদ রাজনীতির বিষয় নয় : শ্রীভাগবত

কলকাতায় শহীদ মিনারে আর এস এসের বিশাল সমাবেশ

মঞ্চে বাঁদিক থেকে সত্যনারায়ণ মজুমদার, রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহনরাও ভাগবত, অতুল বিশ্বাস ও তিলকরঞ্জন বেরা।– ছবি ঃ বাসুদেব পাল

নিজস্ব প্রতিনিধি।। সরসঙ্ঘচালক প্রণাম—এক। শহীদ মিনারে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো গণবেশ পরা এবং নাগরিকবেশে থাকা স্বয়ংসেবকদের হাতগুলো বুকের কাছে অনুভূমিকভাবে উঠে এল। সরসঙ্ঘচালক প্রণাম—দুই। এবার মস্তক অবনত হলো স্বয়ংসেবকদের। সরসঙ্ঘচালক প্রণাম—তিন। হাত টান টান করে আবার দাঁড়িয়ে পড়লেন তাঁরা। মঞ্চে তখন শুধুই মোহনরাও ভাগবত। মঞ্চের বাঁদিকে নীচে সঙ্ঘস্থানে দাঁড়িয়ে 'বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন'কে প্রণাম জানাচ্ছেন নিবর্তমান সরসঙ্ঘচালক কুপ্পহল্লী সীতারামাইয়া সুদর্শনজীও। এক বিদেশীনি ভদ্রমহিলা উৎসুক নেত্রে ছবি তুলছিলেন সেই অপরূপ দৃশ্যের। প্রণাম নিবেদনের সময় অকস্মাৎ স্থবির হয়ে গেল তাঁর ক্যামেরাও। তাঁর পরিচয়টা জেনে রাখা ভালো। কারণ আর পাঁচটা বিদেশীনি-র মতো কোনও 'নিছক' পরিচয় নেই তাঁর। তিনি হলেন স্বয়ং মার্কিন কনসাল জেনারেল বেথ পেন। স্থানুবৎ উপস্থিত সাংবাদিকরাও। রেড রোডের দিক থেকে ভেসে আসা অনবরত গাড়ির হর্ন কিংবা বিধান মার্কেটের সামনে গাড়ি স্টার্ট দেবার শব্দও কর্ণগোচর হচ্ছে না। রাণী রাসমণি রোড সংলগ্ন বাসস্ট্যাণ্ড থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের উদ্দেশ্যে বাস ছাড়ার ঘোষণাও যেন সেই মুহূর্তটুকুর জন্য ক্ষান্ত দিয়েছে। প্রণামের ভঙ্গিমার গুণতিটুকু বাদ দিলে সারা মাঠ জুড়ে বিরাজ করছে অখণ্ড নীরবতা। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ তিলকরঞ্জন বেরার কথামতো 'গত ছ' মাস অধীর আগ্রহে অপেক্ষার পর' স্বয়ংসেবকদের সামনে তখন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের 'পরম পূজনীয়

(এরপর ৪ পাতায়)

শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পাঁচশ বর্ষ পূর্তিতে মহাসংকীর্তন যাত্রা

কাটোয়ায় মহাসংকীর্তন যাত্রা।

কাটোয়া থেকে ফিরে বাসুদেব পাল।। 'পাঁচশ বছর আগে ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করে নাম সংকীর্তনের মাধ্যমে মধ্যযুগের মুসলমান শাসনে ক্লিষ্ট হিন্দু ধর্মকে উজ্জীবিত করে রক্ষা করেছিলেন। সেসময়ের পরিবেশের সঙ্গে আজকের পরিস্থিতির খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। কাটোয়া থেকে যে যাত্রা শুরু হলো সেই যাত্রায় সম্মিলিত হয়ে আরও একবার নামগানে মাতোয়ারা হয়ে সেই ঋষি-ঋণ পরিশোধ করতে হবে।'

গত ১৯ জানুয়ারি কাটোয়ায় শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের পাঁচশ বছর পূর্তি উপলক্ষে মহাসংকীর্তন যাত্রার শুভারম্ভ হয় এক অখণ্ড সংকীর্তন শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে। সকাল ৯টায় মাধাইতলা মন্দির থেকে শুরু হয়ে গৌরাঙ্গমন্দিরে (যেখানে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস নিয়েছিলেন) যাত্রা শেষ হয়। তারপর দুপুর আড়াইটায় কাটোয়া কাশীরাম দাস হাইস্কুল মাঠে এক ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই ধর্মসভায় উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক সাধারণ সম্পাদক ডাঃ প্রবীণভাই তোগাড়িয়া। শ্রী তোগাড়িয়া আরও বলেন, শ্রীচৈতন্যদেবই ভারতে প্রথম অসহযোগ তথা অহিংস ঘেরাও আন্দোলনের প্রবর্তক। শুধু তাই নয়, তিনিই (চৈতন্যদেব) অহিন্দুকে হিন্দু করেছেন আজ থেকে ৫০০ বছর আগেই। সেই সূত্রকে অনুসরণ করেই বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে গত দশ বছরে ৩ লক্ষ খৃস্টান এবং ১ লক্ষাধিক মুসলমান পূর্বপুরুষের ধর্মে ফিরে এসেছেন। শ্রীতোগাড়িয়া বলেন, সৃষ্টির শুরু থেকেই হিন্দুধর্ম পৃথিবীজুড়ে বিদ্যমান ছিল। ২০০০ বছর আগে একজনও খৃস্টান বা মুসলমান সারা পৃথিবীতে ছিল না। আমাদের সংকল্প মন্ত্রেই বলা আছে সৃষ্টির প্রাচীনত্বের কথা। সত্যযুগে যজ্ঞ, দ্বাপর যুগে তপস্যায় ফললাভ হয়। আর কলিযুগে হরিনাম সংকীর্তনে সেই ফল পাওয়া যায়।

(এরপর ৪ পাতায়)

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!
SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life সীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।
যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist, Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।
যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন –
Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221
SBI Life INSURANCE
With Us, Your's Sure

মাননীয় সুদর্শনজীর সঙ্গে কালিদাস বসু। পিছনে অমল কুমার বসু ও কেশব দীক্ষিত।

হাওড়া স্টেশনে মোহনজীকে অভ্যর্থনা। ছবি ঃ বাসুদেব পাল

শহীদ মিনারে স্বয়ংসেবকদের সমাবেশের একাংশ। ছবি ঃ শিবু ঘোষ

দর্শকদের মাঝে মার্কিন কনসাল জেনারেল বেথ পেন।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সংসদীয় গণতন্ত্রের সংস্কার

ইহা অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয় যে গত ষাট বছরেরও বেশি সময় ধরিয়া আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু রহিয়াছে। বিশেষত প্রতিবেশী দেশগুলিতে মাঝেমধ্যেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যেখানে বিপর্যস্ত, যেখানে এই ১২০ কোটি মানুষের দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বজায় রাখিবার জন্য ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চলিতেছে। সেইসঙ্গে তৃণমূল অর্থাৎ পঞ্চায়েতস্তর পর্যন্তও গণতান্ত্রিক চিন্তা-ভাবনা যাহাতে কার্যকর হয়, সেই প্রচেষ্টাও অব্যাহত। এইসব ইতিবাচক দিকগুলির কথা স্মরণ রাখিয়াও বলিতে হয়, আমাদের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এখনও বহু ফাঁক ও ফাঁকি রহিয়া গিয়াছে। যেমন, আমাদের বহুদলীয় গণতন্ত্রে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের প্রক্রিয়াটির কথাই ধরা যাইতে পারে। গত ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকাইলে দেখা যাইবে, সিপিএম তেত্রিশ শতাংশ ভোট পাইয়া মাত্র নয়টি আসন পাইয়াছে। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস ইহা অপেক্ষা দুই শতাংশ ভোট কম অর্থাৎ একত্রিশ শতাংশ ভোট পাইয়া ১৯টি আসন অর্থাৎ 'ডবলে'র বেশি আসন পাইয়াছে। শুধু তাই নয়, এই সূত্রেই লক্ষ্য করা যাইতেছে, বামফ্রন্টের তিন শরিকদল সিপিআই, আরএসপি ও ফরোয়ার্ড ব্লক প্রত্যেকে ভোট পাইয়াছে তিন শতাংশের কিছু বেশি এবং প্রতিটি দলই দুইটি করিয়া আসন লাভ করিয়াছে। অন্যদিকে বিজেপি ছয় শতাংশের বেশি ভোট পাইয়া মাত্র ১টি আসন লাভ করিয়াছে। তাই প্রশ্ন উঠিতেই পারে, ইহা কী ধরনের গণতন্ত্র? গণতন্ত্রে তো সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্ব যথাযথভাবেই প্রতিফলিত হওয়া উচিত। এইক্ষেত্রে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (প্রোপোরশানাল রিপ্রেজেন্টেশন)-এর বিষয়টি লইয়া ভাবনা-চিন্তা করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় হইল, আমাদের জনপ্রতিনিধিরা যে বিপুল অর্থ ও নানা ধরনের সুযোগ সুবিধা পাইয়া থাকেন তাহাতে তাঁহাদের দেশের সর্বোচ্চ বেতনভোগীদের মধ্যে অনায়াসেই রাখা যায়। কিন্তু দেখা যাইতেছে সংসদের কর্মক্ষমতা ও আলোচনার মান ক্রমশই নিম্নাভিমুখী। এমনও বলা হইতেছে, সংসদে এখন বিতর্ক আর আলোচনা প্রাথমিক স্কুলের বিতর্ক সভাকেও হার মানায়! শুধু তাই নয়, সাংসদদের অনেকের আচরণও যেন অন্য ধরনের হইয়া যাইতেছে। হৈ-চৈ, গালিগালাজ, ওয়াক-আউট, চীৎকার, ধস্তাধস্তি ইত্যাদি আমাদের আইনসভাগুলিকে প্রায়ই কলুষিত করিয়া তুলিতেছে। এই যেখানে অবস্থা, সেখানে সংবিধান সংশোধন করিয়া ভোটারদের হাতে প্রতিনিধিদের 'রিকল' অর্থাৎ ফিরাইয়া আনিবার ক্ষমতা দেওয়া উচিত নয় কি? কেননা তাহারাই ভোট দিয়া সাংসদ ও বিধায়কদের আইনসভায় পাঠান। সেক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে, তাঁহাদের কেউ কেউ জনসাধারণের প্রতি কর্তব্য পালনে অনিচ্ছুক বা প্রতিশ্রুতি রক্ষায় অপারগ, তাহা হইলে তাঁহাদের সরাইয়া দিয়া অন্য ব্যক্তিদের আইনসভায় পাঠানোর ক্ষমতা ভোটারদের হাতে থাকা দরকার।

জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের প্রক্রিয়া, সাংসদদের গুণগতমান ও আচরণ যেমন আমাদের বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষতচিহ্ন স্বরূপ, তেমনই ভোটার হিসাবে আমাদের দায়িত্বটাও কম নয়। ভোটদানে ভোটারদের উদাসীনতা বাস্তব সত্য। ভোটদানের হার যে সন্তোষজনক নয়, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু ভোটদান যেমন অধিকার, তেমন কর্তব্যও বটে। বস্তুত নির্বাচনী সংস্কারের জন্য সরকারি ও বেসরকারি স্তরে গঠিত সমস্ত কমিটি ভোটদানকে শুধু অধিকার নয়, কর্তব্য হিসাবেও বিবেচনা করিবার সুপারিশ করিয়াছে। যদিও এই বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলি এখনও একমত হইতে পারে নাই। এই পরিপ্রেক্ষিতে গুজরাট বিধানসভায় উত্থাপিত স্থানীয় প্রশাসন বিল (সংশোধনী)-এর প্রসঙ্গটি উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই বিলে ভোটদানকে আবশ্যিক করিবার কথা বলা হইয়াছে। বিলটি লইয়া বিতর্ক হইতে পারে কিন্তু নির্বাচনী সংস্কারের ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপটি তাৎপর্যপূর্ণ।

আমাদের সংসদীয় গণতন্ত্রকে আরও সার্থক তথা বলিষ্ঠ করিতে হইলে তাই এইসব প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলির সংস্কার আশু প্রয়োজন। এবং এই ক্ষেত্রে দেশের মানুষের সচেতনতাই গণতান্ত্রিক সংস্কারের কাজটি ত্বরান্বিত করিতে পারে।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

আমার দেশ শ্রেষ্ঠ, আমার জাতির আচার, বিচার, ধর্ম, চরিত্র, নীতি, বল, বিক্রম, বুদ্ধি, মত, কর্ম—উৎকৃষ্ট ও অতুল্য এবং অন্য জাতির পক্ষে দুর্লভ—এই অভিমান, আমার দেশের হিতে আমার হিত, আমার দেশের গৌরবে আমার গৌরব, আমার দেশভাই-এর বৃদ্ধিতে আমি বর্ধিত—এই বিশ্বাস, কেবল আমার স্বার্থসাধনা না করিয়া তাহার সহিত দেশের স্বার্থ সম্পাদন করিব; দেশের মান, গৌরব ও বৃদ্ধির জন্য যুদ্ধ করা প্রত্যেক দেশবাসীর কর্তব্য, আবশ্যক হইলে সেই যুদ্ধে নির্ভয়ে আত্মবিসর্জন করা বীরের ধর্ম, এই কর্তব্য-বুদ্ধি জাতীয় ভাবের প্রধান লক্ষণ।

যিনি নিজের 'অহং' দেশের 'অহং'-এ বিলীন করিতে পারেন, তিনি আদর্শ স্বদেশপ্রেমিক, যিনি নিজের 'অহং' সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া তাহার দ্বারা দেশের 'অহং' বর্ধিত করেন তিনি জাতীয় ভাবাপন্ন। সেই কালের ভারতবাসীরা জাতীয় ভাবশূন্য ছিলেন। তাঁহারা যে কখনও জাতীয় হিত দেখিতেন না, এমন কথা বলি না। কিন্তু জাতির ও আপনার হিতের মধ্যে লেশমাত্র বিরোধ থাকিলে প্রায়ই জাতির হিত বর্জন করিয়া নিজ হিত সম্পাদন করিতেন। একতার অভাব অপেক্ষা এই জাতীয়তার অভাব আমাদের মতে মারাত্মক দোষ। পূর্ণ জাতীয় ভাব দেশময় ব্যপ্ত হইলে এই নানা সঙ্কট সঙ্কুল দেশেও একতা সম্ভব। কেবল একতা চাই—একতা চাই বললেই একতা সাধিত হয় না।

—শ্রী অরবিন্দ

আমাদের গণতন্ত্র ঃ সংস্কার সম্ভব?

তথাগত রায়

আমাদের গণতন্ত্র তথা সংবিধান নিয়ে আমরা সঙ্গতভাবেই শ্লাঘা অনুভব করি, এবং পার্শ্ববর্তী দেশ, যারা গণতন্ত্র আগাগোড়া রাখতে পারেনি তার সঙ্গে তুলনা করি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমাদের গণতন্ত্র সর্বাঙ্গ সুন্দর। অবশ্য মানুষের সৃষ্ট কোনও জিনিসই সর্বাঙ্গসুন্দর বা Perfect হতে পারে না—কিন্তু আমাদের গণতন্ত্রের সম্বন্ধে গর্ব অনুভব করেও একথা অবশ্যই বলা সম্ভব যে এ-গণতন্ত্রে অনেক খামতি আছে, এবং সংস্কারের প্রয়োজন আছে। সেই ব্যাপারেই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ।

পশ্চিমবঙ্গ লোকসভা নির্বাচন, ২০০৯

দল	% প্রাপ্ত ভোট	ভোট	নির্বাচিত প্রতিনিধি
সিপিএম	৩৩.১০	১,৪১,৪৪,৬৬৭	৯
তৃণমূল	৩১.১৭	১,৩৩,২১,২৯৫	১৯
কংগ্রেস	১৩.৪৫	৫৭,৪৯,০২৯	৬
বিজেপি	৬.১৪	২৬,২৫,১৮২	১
সিপিআই	৩.৬০	১৫,৩৮,২১১	২
আর এস পি	৩.৫৬	১৫,২০,৭৭২	২
ফরোয়ার্ড ব্লক	৩.০৪	১২,৯৯,৫০৭	২
অন্যান্য	৫.৯৪	২৫,৩০,৮৯৩	১
মোট	১০০	৪,২৭,২৯,৫৪৮	৪২

আমরা যাকে গণতন্ত্র বলি তাকে আর একটু খোলসা করে বলা যায় বহুদলীয় গণতন্ত্র। চীন বা কিউবা নিজেদের গণতান্ত্রিক বলে জাহির করলেও, বা তাদের আদিম গুরুঠাকুর লেনিন আমাদের সংসদকে শুয়োরের খোঁয়াড় বললেও, আজকের পৃথিবীতে বহুদলীয় গণতন্ত্রই প্রকৃত গণতন্ত্র বলে স্বীকৃত। কিন্তু এই বহুদলীয় গণতন্ত্রেও কিছু মূল শ্রেণীবিভাগ আছে। এই বিভাগ প্রধানত দুটি ক্ষেত্রে—একটি জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে, অন্যটি নির্বাচন প্রক্রিয়া ও সরকার গঠনের ক্ষেত্রে। ছাপ দিয়ে ভোট হবে কী যন্ত্রে ভোট হবে, সেটা কোনও মৌলিক প্রভেদ নয়, তাই সে-আলোচনার যাচ্ছি না।

জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে প্রক্রিয়াটির সঙ্গে আমরা পরিচিত, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তার নাম ফার্স্ট-পাস্ট-দা-পোস্ট (First-past-the-post), সংক্ষেপে FPTP। বাংলায় বলা যায় 'প্রথম ঘোড়া'। বলা বাহুল্য, উপমাটি ঘোড়দৌড়ের মাঠ থেকে নেওয়া। এই প্রক্রিয়ায় ঘোড়দৌড়ের মাঠে দশটি বা বারোটি ঘোড়ার মধ্যে যেটি প্রথম হয় সেই-ই প্রাইজ পায়—তেমনি নির্বাচনে দশজন বা বারোজন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেশি ভোট পান তিনিই নির্বাচিত হন।

কিন্তু এই প্রক্রিয়া, যা বৃটিশ ব্যবস্থা থেকে নেওয়া, তাতে মৌলিক গলদ আছে। ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ারা কারুর প্রতিনিধিত্ব করে না—কিন্তু নির্বাচনে যাঁরা লড়েন তাঁরা প্রতিনিধিত্বই করেন। এখন, একটা কাল্পনিক উদাহরণ নেওয়া যাক। ধরা যাক্, একটা নির্বাচনে এগারোজন প্রতিদ্বন্দ্বী আছেন। ধরা যাক্, তাঁদের মধ্যে দশজন নয় শতাংশ করে ভোট পেলেন—মোট নব্বই শতাংশ, কেবল একজন দশ শতাংশ ভোট পেলেন। তাহলে শেষোক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীই জিতবেন—যদিও নব্বই শতাংশ ভোটদাতা তাঁর বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। এবার এটাকে যদি দলের ক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া যায়, এবং ধরা যায় যে একটি রাজ্যের বিধানসভার একশোটি আসন আছে, এবং প্রতিক্ষেত্রেই উপরোক্ত ধরনের ভোট-পড়েছে এবং প্রতিক্ষেত্রেই দশ শতাংশ ভোটে জেতা প্রতিদ্বন্দ্বী একটি বিশেষ দলের তা হলে কী হবে? তা হলে এই হবে, যে বিধানসভায় একশো সদস্যের মধ্যে একশোজনই এমন একটা দলের হবেন, যারা মাত্র দশ শতাংশ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছে, এবং নববই শতাংশ মানুষের সরকারে বা বিধানসভার কোনও প্রতিনিধিত্বই থাকবে না। তাহলে প্রশ্ন উঠবে, এ কেমন গণতন্ত্র?

কেউ বলতে পারেন, এরকম সমীকরণ বাস্তবে সম্ভব নয়, প্রাপ্ত ভোট কখনও সমস্ত ভোটপ্রার্থীদের মধ্যে সমানভাবে বা প্রায়-সমানভাবে বিতরিত হতে পারে না। একথা ঠিক যে নির্বাচনে দুজন বা তিনজন ভোটপ্রার্থীই বেশিরভাগ ভোট পান, এমনই দেখা যায়—বাকিরা নেহাতই নামেমাত্র ভোট পান। কিন্তু বাস্তবে অন্যরকম একটা জিনিস দেখা যায়, যেটার সঙ্গে এই প্রবন্ধ লেখক ব্যক্তিগতভাবে এবং রাজনৈতিকভাবে সম্পর্কিত—সেটা একটু খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে এককভাবে লড়েছিল, এবং কোনও আসন পায়নি। কিন্তু বিভিন্ন দল কত ভোট পেয়েছিল তা একবার দেখা যাক্। (সারণী দ্রষ্টব্য)

এখন, সিপিএম-এর আসনসংখ্যা বত্রিশ বছরের কুশাসনের ফলে মাত্র ৯-এ গিয়ে ঠেকেছে তাতে আমি খুশি নিশ্চয়ই, কিন্তু মনে একটা খুঁতখুঁতানি থেকে যাচ্ছে, এটা বোধ হয় ঠিক হলো না। একদল তেত্রিশ শতাংশ ভোট পেয়ে মাত্র ন'টা আসন পাবে, আর অন্যদল তার চেয়ে দুই শতাংশ কম ভোট পেয়ে তার ডবলের বেশি আসন পাবে, এ কোন-দেশি কথা? এতে তো জনমতের প্রতিফলন হল না! সিপিএম রিগিং করে, জবরদস্তি করে, সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে তেত্রিশ শতাংশ ভোট পেয়েছে এ কথা ঠিক—কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ অন্য একটা দিক্। এবার বামফ্রন্টের তিন ছোট শরিক এবং পাশাপাশি বিজেপি-র দিকে তাকানো যাক্। সিপিআই, আর এসপি এবং ফরোয়ার্ড ব্লক প্রত্যেকে ভোট পেয়েছে তিন শতাংশের ঘরে, কিন্তু আসন পেয়েছে দুটি করে, অর্থাৎ প্রায় পাঁচ শতাংশ।

অপরপক্ষে বিজেপি এদের প্রায় ডবল ভোট পেয়েছে, কিন্তু মাত্র একটি আসন পেয়েছে। অর্থাৎ যে ৬.১৪ শতাংশ মানুষ পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন সংসদে তাঁদের মাত্র একজন প্রতিনিধি। এ-ই বা কোন দেশি-কথা?

আমরা জানি, এটা সম্ভব হয়েছে জোট রাজনীতি, মেরুকরণ এবং দলের সমর্থন কতটা ছড়িয়ে আছে তার ভিত্তিতে। শেষোক্তটির ব্যাপারে বলা যায়, যদি কোনও দলের সমর্থন একটি বা দুটি কেন্দ্রে সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে সে আসন জিতবেই, কিন্তু সেই সমর্থন যদি রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে থাকে তা হলে জিতবে না। এস.ইউ.সি-র ক্ষেত্রে বিধানসভা নির্বাচনে এই জিনিসটা হয়। কিন্তু গণতন্ত্রে তো সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্ব যথাযথভাবেই হওয়া উচিত। জোট, মেরুকরণ—এগুলো তো কূটকৌশলের ব্যাপার! এগুলো প্রতিনিধিত্বকে এভাবে প্রভাবিত করবে কেন?

এই অবিচার ঠেকাতে, ইউরোপের বেশিরভাগ দেশ এই বৃটিশ এফ পি টি পি ব্যবস্থা ছেড়ে আর একটি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে, যার নাম প্রপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন, বাংলায় বলা যায় আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব। এতে প্রতি দল একটি প্রার্থী তালিকা জমা দেয়, এবং প্রার্থীর ভিত্তিতে নয়, তালিকার ভিত্তিতে নির্বাচন হয়। এতে কোনও বিশেষ কেন্দ্রে বিশেষ প্রার্থী থাকে না। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ২৯৪-টি আসন আছে। এবার, নির্বাচন যখন ঘোষণা হলো তখন প্রত্যেক পার্টি এই ২৯৪-টি আসনের জন্য, বা তার কম আসনের জন্য প্রার্থী তালিকা জমা দিল। এই তালিকায় কোনও প্রার্থী কোনও বিশেষ কেন্দ্রের নন, কিন্তু প্রতিটি প্রার্থীর একটি ক্রমিক সংখ্যা আছে।

এবার দেখা গেল, সিপিএম ৩০ শতাংশ ভোট পেয়েছে, তৃণমূল ৪০ শতাংশ পেয়েছে, বিজেপি ১০ শতাংশ পেয়েছে ইত্যাদি। ২৯৪ সংখ্যার ৩০ শতাংশ হচ্ছে ৮৮, ৪০ শতাংশ হচ্ছে ১১৮, ১০ শতাংশ হচ্ছে ২৯। তাহলে সিপিএম-এর তালিকা থেকে ১নং থেকে ৮৮নং প্রার্থী নির্বাচিত, তৃণমূল-এর তালিকা থেকে ১নং থেকে ১১৮নং প্রার্থী নির্বাচিত এবং বিজেপি-র তালিকা থেকে ১নং থেকে ২৯নং প্রার্থী নির্বাচিত—ফল এইরকম হবে। এক্ষেত্রে জোট করে কোনও লাভ হবে না, ভোট কতটা ছড়িয়ে আছে তারও কোনও গুরুত্ব থাকবে না।

নির্বাচন প্রক্রিয়া ও সরকার গঠন ব্যাপারেও গণতন্ত্রের রকমফের আছে, যাকে বলা যায় বৃটিশ প্রক্রিয়া এবং মার্কিন প্রক্রিয়া। বৃটিশ প্রক্রিয়ায় প্রথমে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হন, তারপরে তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ (পড়ুন যে পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে) সদস্যের সমর্থন নিয়ে একজন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। তারপর এই প্রধানমন্ত্রী সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকেই মন্ত্রিসভার অন্য সদস্যদের চয়ন করেন।

অর্থাৎ এই প্রক্রিয়ায় প্রত্যেক মন্ত্রীকেই ভোটে দাঁড়াতে হয় এবং সংসদের সদস্য হতে হয়। এই মন্ত্রিসভা সংসদের কাছে দায়বদ্ধ, এবং যতদিন অধিকাংশ সংসদ সদস্যের সমর্থন থাকে ততদিনই মন্ত্রিসভা চলে। সমর্থন চলে গেলে (যা অনাস্থা প্রস্তাবের মাধ্যমে হয়) মন্ত্রিসভা পড়ে যায়, এবং নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করতে হয়।

(এরপর ১২ পাতায়)

মহাসংকীর্তন যাত্রা

(১ পাতার পর)

একথা ৫০০ বছর আগে শ্রীচৈতন্যদেব প্রচার করে জনজাগরণ করেছিলেন ওড়িশা এবং বাংলায়।

প্রবীণভাই অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ঘোষণা করেন, আবার হিন্দুধর্মের বিজয় বৈজয়ন্তী সর্বত্র উড্ডীয়মান হবে।

এদিন সকালে প্রায় দু'হাজার মানুষের সংকীর্তন যাত্রা শুরু হয় মাধাইতলা মন্দির থেকে। আবালবৃদ্ধ বনিতা সেই যাত্রায় যোগ দেন। অনেক মত-পথের সন্তরাও যোগ দেন। ২৭ দিন ব্যাপী এই সংকীর্তন যাত্রা ৫০০ বছর আগে যে পথ ধরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পুরীধামে পৌঁছেছিলেন সেই পথেই যাবে। ১৪ ফেব্রুয়ারি পুরী পৌঁছাবে। সঙ্গে কয়েকটি সুসজ্জিত রথ—শ্রীশ্রীজগন্নাথ এবং গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের মূর্তি সেখানে রয়েছে। রয়েছে শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ণাবয়ব মূর্তি। কাটোয়ার মানুষ যাত্রাপথে এগিয়ে এসে মূর্তিকে প্রণাম জানিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। কয়েকটি সুসজ্জিত ট্যাবলোও যাত্রায় ছিল। শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দিরের মুখে কয়েকজন বয়স্কা মহিলাকে সংকীর্তন যাত্রীদের পদধুলি মাথায় নিতে দেখা গেল। সারা কাটোয়া হরিনামে মাতোয়ারা। পরিচিত অথচ নতুন দৃশ্য। গ্রাম গ্রাম থেকে চৈতন্য অনুরাগীরা সপরিবারে পৌঁছেছেন।

গৌরাঙ্গ মন্দিরে নতুন মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠার সময় উপস্থিত ছিলেন ডাঃ প্রবীণভাই তোগাড়িয়া।

দুপুরের ধর্মসভায় প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন কাটোয়া যাত্রা অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পুরবধি মুখোপাধ্যায়। কেন্দ্রীয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক সোমনাথ নন্দী প্রাস্তাবিক ভাষণ দেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন—সমিতির সভাপতি শ্রীমদ্ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী, সহ-সভাপতি স্বামী অশোকানন্দ গিরি। অন্যতম সংযোজক শ্রীমদ্ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী, শ্রীমৎ স্বামী জীবনচৈতন্য মহারাজ, স্বামী কমলেশানন্দ, ভাগবত ভৌমিক এবং অন্যান্যরা।

সভায় পৌরোহিত্য করেন নন্দদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। সুললিত কণ্ঠে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী অভয়া বন্দ্যোপাধ্যায়। সব মিলিয়ে প্রথম দিনের যাত্রা ছিল বেশ জাঁকজমকপূর্ণ, উৎসবমুখর।

সন্ত্রাসবাদ রাজনীতির বিষয় নয় ঃ শ্রীভাগবত

(১ পাতার পর)

ষষ্ঠ সরসঙ্ঘচালক' মোহনরাও ভাগবত।

স্বয়ংসেবক আর নাগরিকদের এই সমাবেশের দিনটি সর্বজনশ্রুত ২৩ জানুয়ারি। সময় দুপুর ৩টে। ১৯৪৫-এর পর দীর্ঘ সাড়ে ছ' দশক যা কেবলমাত্র 'ইন্টারন্যাশানাল পলিটিক্স ডে'-হিসেবেই পালিত হয়ে এসেছে! যে 'পলিটিক্সে'র বিষয়বস্তু প্রথমত, নেতাজী-র 'কী' হয়েছে, 'অন্তর্ধান' না 'মৃত্যু'? দ্বিতীয়ত, দিনটিকে 'দেশপ্রেম দিবস' হিসেবে 'সম্প্রতি' ঘোষণা 'একদা' তেজোর কুকুর গালাগাল-খ্যাত কমিউনিস্টদের। তৃতীয়ত, মহাকরণে নেতাজীর ছবিতে মাল্যদানকে কেন্দ্র করে এবছরের 'এক্সক্লুসিভ' কাজিয়া। এসব কিছুর উর্দ্ধে উঠে আর এস এসের ক্ষেত্রীয় কার্যবাহ সত্যনারায়ণ মজুমদার 'নেতাজী'র পথেই বর্ণহীন, বিভেদহীন সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজ রচনার স্বপ্ন দেখালেন। নেতাজীকে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা মোহনজী তারপর মানবেন্দ্রনাথ রায়ের 'র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজিম'-কে প্রতিধ্বনিত করে মন্তব্য করলেন—'সম্পূর্ণ দেশ মেরা হ্যায়' এই ভাবনা যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রত্যেক দেশবাসীর হৃদয়ে জাগ্রত হবে, ততক্ষণ দেশের কোনও পরিবর্তন হবে না। ক্ষেত্রীয় সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আর প্রান্ত সঙ্ঘচালক অতুল বিশ্বাসকে পাশে নিয়ে তিনি জানালেন, নেতাজী শুধু বৃটিশদের হাত থেকে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের স্বপ্ন দেখেননি। চিন্তাভাবনাসহ অন্যান্য দিকগুলিরও পরিবর্তন চেয়েছিলেন। বাংলাতেও পরিবর্তনের হাওয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। স্বয়ংসেবকদের সামনে ইনি 'নেতাজীভক্ত' মোহনরাও ভাগবত।

'গ্লোবাল ওয়ার্মিং'-এর পয়লা নম্বর ভিলেন হিসেবে সারাবিশ্ব জানে কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে, কিন্তু এর সমাধান? গোটা পনেরো 'কনফারেন্স অব পার্টিজ (১৯২টি দেশ)' হবার পরেও বেরোয়নি। উপায় বাতলালেনও তিনি। বলে দিলেন, পাল্টাতে হবে জীবনশৈলী, গোঁড়ামি ছাড়তে হবে। সারাবিশ্বে একটি মাত্র 'ভাষা' চলবে না। সকলের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে হবে। হিন্দু সংস্কৃতি ও জীবন পদ্ধতি ছাড়া কোথাও এই ভাবনার সন্ধান পাওয়া যাবে না। হিন্দুত্বের বিকাশেই দেশের বিকাশ হবে। সরে আসতে হবে 'চাওয়া-পাওয়া' ব্যাপারটাকে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া পাশ্চাত্য ভোগবাদ থেকে। স্বয়ংসেবকদের সামনে ইনি 'পরিবেশপ্রেমী' মোহনরাও ভাগবত।

মোহনজীর বক্তব্য—দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় চীন যাতে তাদের প্রভাব বিস্তার না করতে পারে এটা আমাদের নিশ্চিত করা দরকার। আমরা এখনও জানি না কেন তিব্বতকে চীনের হাতে তুলে দেওয়া হলো।

কলকাতায় সাংবাদিক সম্মেলনে মোহনরাও ভাগবত। তাঁর ডানদিকে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাঁদিকে অতুল বিশ্বাস। — ছবি ঃ বাসুদেব পাল

আমাদের সামরিক শক্তিকে এতটাই শক্তিশালী করতে হবে যাতে কেউ চ্যালেঞ্জ করতে সাহস না পায়। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর অনুপ্রবেশের খবর রোজ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু সরকার বা সেনাবাহিনী আসলে যে কি ঘটছে তা জানাচ্ছে না। আমাদের এটা জানার অধিকার আছে। স্বয়ংসেবকদের সামনে ইনি 'প্রতিরক্ষা নিয়ে উদ্বিগ্ন' মোহনরাও ভাগবত।

এটা মানতেই হবে—অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আজ বিপন্ন। সন্ত্রাসবাদ আর যাইহোক রাজনীতির বিষয় হতে পারে না। সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় রাজনীতির উর্ধে উঠতে হবে। দুর্ভাগ্যবশত কয়েকটি রাজ্য এক্ষেত্রে নরম মনোভাব নিয়েছে। দীর্ঘ ৬০ বছর ধরে ভারতের সঙ্গে শত্রুতা করেছে পাকিস্তান। তাদের সঙ্গে বহুবার বন্ধুত্বের প্রয়াস চালিয়েছে ভারত। কিন্তু তারপরেই ঘটেছে সংসদ ভবনে হামলা বা ২৬/১১-এর মতো ঘটনাবলী। এখনও হামলা বন্ধের কোনও নিশ্চয়তা দিচ্ছে না তারা। সুতরাং পাকিস্তানকে উচিত শিক্ষা পেতেই হবে। স্বয়ংসেবকদের সামনে ইনি পাকিস্তানকে দাবড়ে দেওয়া 'সুরক্ষা প্রশ্নে অনমনীয়' মোহনরাও ভাগবত।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আত্মবলিদানের মর্যাদা আজও দিতে পারেনি ভারত সরকার। পাক-অধিকৃত কাশ্মীর প্রসঙ্গে এখন একমাত্র যে মন্তব্যটি করা যায়, সেটা হলো, 'কাশ্মীর কবে ভারতে আসবে'। বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান—ভারতবর্ষের পূর্ব আর পশ্চিমপাড়ের হিন্দুদের ভাগ্যে জুটেছে একই ট্র্যাজিক পরিণতি। পূর্বপাড়ের শরণার্থী হিন্দুদের মতোই পশ্চিমের ৩ লক্ষ কাশ্মীরি পণ্ডিতের জোটেনি চাকরি, রেশন কার্ড কিংবা ভোটদানের অধিকার। এদিকে দু'প্রান্তেই অনুপ্রবেশের ফলে দুর্বিসহ হচ্ছে গ্রাম্য জীবন। বাড়ছে চুরি, স্মাগলিং। ভারতীয় অর্থব্যবস্থার উপর বোঝা হয়ে উঠছে অনুপ্রবেশকারীরা। কিন্তু ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতি বড় বালাই। তাই সীমা সুরক্ষিত রাখতে যা যা করণীয়, মুসলিম তোষণের স্বার্থে সরকার তার কিছুই করছে না। স্বয়ংসেবকদের সামনে ইনি 'শ্যামাপ্রসাদের কর্মধারার সার্থক উত্তরসূরী' মোহনরাও ভাগবত।

প্রধানমন্ত্রীর মৌখিক বিবৃতি—পশ্চিমী জীবনশৈলী আমাদের ক্ষতি করছে। কিন্তু তাঁর হাব-ভাব দেখলে সেটা বিশ্বাস করা খুব শক্ত। সেই হাব-ভাবের কিছু নমুনা—৭ কোটি কৃষকের জীবন ও জীবিকার বারোটা বাজিয়ে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের নামে কৃষিজমি অধিগৃহীত হচ্ছে। জাঁকিয়ে বসছে বিদেশী বহুজাতিক সংস্থাগুলো। যে কারণে 'মনমোহনীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে'র নমুনা হচ্ছে—গরীবী, বেকারত্ব আর রোজগারহীনতা। স্বয়ংসেবকদের সামনে ইনি 'অর্থনীতি-সমালোচক' মোহনরাও ভাগবত।

'সংখ্যাগুরু' আর 'সংখ্যালঘু'—এই দুই লেবেল সাঁটিয়ে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সংরক্ষণ নীতির মতো দ্বিচারিতা ভূ-ভারতে আর দু-দু'টো খুঁজলেও পাবেন না। বিবিধের মধ্যে ঐক্য—এই চিরাচরিত সত্যিটাকে মেনে 'সবাই ভারতবাসী' বোধটাই অবলুপ্ত হয়েছে সরকারি তোষণ নীতির কৃপায়। সেই কৃপাবশত, স্বতন্ত্র ভারতবর্ষে শিক্ষাদান চলছে বিদেশী ভাষায়। এই গুরুতর রোগে মোহনজীর প্রেসক্রিপশান—পশু-পাখী থেকে শুরু করে সকলেই ঈশ্বরের সৃষ্টি—এই চেতনাটাই আগে জাগ্রত করা দরকার। কারণ আমাদের সংস্কৃতি এবং মাতৃভূমি এক, রাষ্ট্রও এক; হিন্দুস্থান হিন্দুরাষ্ট্রই। একমাত্র হিন্দুত্বই সারাদেশকে একসূত্রে গ্রথিত করতে পারে। হিন্দুত্বকে ভিত্তি করেই ভারত বিশ্বগুরু হতে পারে। মুসলিমদের জন্য আলাদা দেশের দাবীর খেসারত দিয়ে ভেঙ্গেছে পাকিস্তান, এবং সেই ভঙ্গুর পাকিস্তানও ভেঙ্গেছে বাংলাদেশ সৃষ্টি করে। স্বয়ংসেবকদের সামনে ইনি 'অখণ্ড ভারতের পূজারী' মোহনরাও ভাগবত।

বিগত ৬০ বছর ধরে বিস্তর পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। কিন্তু তাতে কাজের কাজ মানে 'উন্নয়ন' বাদ দিয়ে বাকি যা যা হওয়া সম্ভব সবই হয়েছে। এই রোগের 'ডায়াগনসিস' করছেন মোহনজী—মানুষের ইচ্ছেটাই লুপ্ত হয়ে গেছে। আমাদের কোনও সম্প্রদায় নেই, প্রান্ত নেই, প্রদেশ নেই। আমরা সবাই এক—উবে গেছে এই দর্শনটাই। একে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করাতে যে ওষুধের প্রয়োজন তার নাম 'পিপুলস উইল'— 'দেশাত্মবোধক চেতনা'। এই চেতনা যদ্দিন না আসে, ততদিন নেতা, নীতি, পার্টি, সরকার, মহাপুরুষ, অবতার এসেও কিছু করতে পারবেন না। এটা একমাত্র দেশভক্তিই পারে। যার উদাহরণ, এলাকাবাসীদের নিয়ে নানাজী দেশমুখের নিজের হাতে তৈরি করা মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের চিত্রকূট।

স্বয়ংসেবকদের সামনে ইনি 'উন্নয়নকামী' মোহনরাও ভাগবত।

স্বয়ংসেবকরা রোজ শাখায় আসেন। কেউ তাঁদের জোর করে আনে না। আসেন স্রেফ আদর্শের তাগিদে, ফললাভের কোনও প্রত্যাশা না করে। সেখানে কাটান একটি ঘণ্টা। খরচা করেন নিজেদের পকেটের পয়সা। এই না হলে দেশের কাজ! কানপুরের ট্রেন দুর্ঘটনাই হোক কিংবা আয়লা-দুর্গত মানুষ, তাঁদের পাশে সবার আগে স্বয়ংসেবকরা। এটাই বোধহয় তাঁদের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। মেয়েরা শাখায় আসতে না পারুন তাঁদের জন্য রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি তো আছে! এই কাজে কোনও পিঠ-চাপড়ানির প্রত্যাশা নেই তাঁদের। সঙ্ঘের কাজ বাড়ানোর ইচ্ছেটুকুও যেন গৌণ। লক্ষ্য একটাই—'ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।' স্বয়ংসেবকদের সামনে ইনি তাদের 'আত্মার আত্মীয়' মোহনরাও ভাগবত।

দেশের কাজে সঙ্ঘকে কেউ ঠেকা দেয়নি। সঙ্ঘও কারুর ঠেকা নেয়নি। 'আমিই ঠিক আর বাকি সব ভুল'—এই কথাটাই যে ভ্রান্ত! মোহনজীর ভাষণ একেবারে শেষপর্বে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সহ-কার্যবাহ প্রদ্যুৎ মৈত্র ধন্যবাদজ্ঞাপন করবেন। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে সংস্কার ভারতীর 'চল রে চল সবে ভারতসন্তান' গানটার আকুতি ক্রমশ ছুঁয়ে যাচ্ছে মোহনজীর এই কথাগুলিকে। স্বয়ংসেবকদের সামনে ইনি 'মানবাত্মার প্রতীক' মোহনরাও ভাগবত।

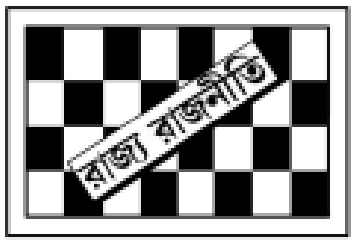

জ্যোতি-কিরণে কি এ বঙ্গরাজ্য দিশা পেয়েছিল?

নিশাকর সোম

এবারের লেখার শুরুতে ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন "কমিউনিস্ট" নেতা জ্যোতি বসুকে শ্রদ্ধা জানাই এবং তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করে তাঁর সম্পর্কেই লিখতে হচ্ছে। ১৯৪৬ সাল থেকে সংসদীয় ব্যবস্থার সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত এবং ২৩ বছরের মুখ্যমন্ত্রিত্বের রাজত্ব করে তিনি রাজকীয়ভাবেই মহাপ্রস্থানের পথে চলে গেলেন।

উল্লেখ করা প্রয়োজন জ্যোতি বসুকে লিডার করার জন্য বহু ক্যাডারকে ল্যাডার (মই) হতে হয়েছিল। বলা দরকার ১৯৪৬-এ ডঃ হুমায়ুন কবীরকে পরাজিত করে তিনি ৮ ভোটে জিতে ছিলেন। তদানীন্তন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত হন। তাঁর এই জয়ের কাণ্ডারী ছিলেন বঙ্কিম মুখার্জি এবং ডাকবিভাগের নেতা ভূপেন ঘোষ (লালদা)। লালদার কাজ ছিল পোস্টাল ব্যালটগুলি সংগ্রহ করে আনা। জ্যোতিবাবু বিলেতে আই সি এস পরীক্ষায় নাকি অকৃতকার্য হওয়াতে পরে ব্যারিস্টারি পড়েন। তখন তিনি নিশ্চয়ই বহু ত্যাগ কষ্ট স্বীকার করেছিলেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন তাঁর সঙ্গে এক ঝাঁক বিলিতি শিক্ষায় শিক্ষিত কেতাদুরস্ত বৃটিশ কমিউনিস্ট নেতা রজনীপাম দত্তের শিষ্যের দল এসেছিলেন রাজনীতি করতে—এঁদের মধ্যে ছিলেন স্নেহাংশুকান্ত আচার্য, ভূপেন্দ্র গুপ্ত (এঁর পিতা মহেন্দ্র গুপ্তও জমিদার ছিলেন), ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, নিখিল চক্রবর্তী, রেণু রায় (বিপিন রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী—পরবর্তীকালে নিখিলবাবুর স্ত্রী), মোহন কুমার মঙ্গলম, চণ্ডি, এস-এ-চারী প্রমুখ।

একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য তা'হল বঙ্কিম মুখার্জির চেষ্টায় জ্যোতি বসু প্রথম নির্বাচিত হন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায়। কিন্তু ১৯৫২-এর প্রথম সাধারণ-নির্বাচনের পর বিধানসভায় জ্যোতিবাবু হন লিডার আর বঙ্কিমবাবু হন ডেপুটি লিডার!

এখানে উল্লেখ করা উচিত রেলের নেতা হিসাবে জ্যোতি বসুকে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন দক্ষিণা চ্যাটার্জি (কলকাতার বৈঠকখানা রোড-নিবাসী), শঙ্কর দীক্ষিত (বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্র), কমল সরকার, আবুল হাসান এবং ননী বসু (খুড়ো) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এঁদের অবদানেই জ্যোতি বসু প্রতিষ্ঠালাভ করেন। এঁদের কথা কি বর্তমান পার্টি নেতৃত্ব জানেন? জ্যোতিবাবু কি এঁদের যথাযথ মর্যাদা দিয়েছিলেন? নেতা উচ্চপদে গেলে নীচের তলার কর্মীদের ভুলে যাবেন এটাই তো রীতি-প্রথা! কমিউনিস্ট পার্টিতে একটা মজার ব্যাপার হলো যদি কেউ বিলিতি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আসেন তিনি নেতৃত্বের পৃষ্ঠপোষকতায় নেতা বনে যান তাড়াতাড়ি। কমিউনিস্ট পার্টিতে কোনও দিনই শ্রমিক দরিদ্র-কৃষকদের মধ্য থেকে নেতা তৈরি হয়নি কেন? কংসারি হালদার, তারাপদ দে (মাস্টার) বা মহঃ ইলিয়াস এবং মহঃ ইসমাইলকে দেখালে চল্‌বে না। কারণ এঁরা কেউই তৃণমূল স্তরের মানুষ ছিলেন না। বিশেষ করে মহঃ ইলিয়াস তো লেবার অ্যারিস্ট্রোক্যাট হয়ে গেছিলেন! জ্যোতিবাবুর অন্তিম যাত্রার পূর্বে যাঁরা শ্রদ্ধা জানাতে আসেন তাঁর মধ্যে লালকৃষ্ণ আদবানি এবং বিজেপি সভাপতি নীতিন গড়কড়ি আসেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন জ্যোতিবাবু জীবদ্দশায় আদবানি এবং বিজেপিকে 'বর্বর' বলে একাধিকবার অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু বিজেপি নেতৃত্বের সৌজন্যবোধের অভাব দেখা

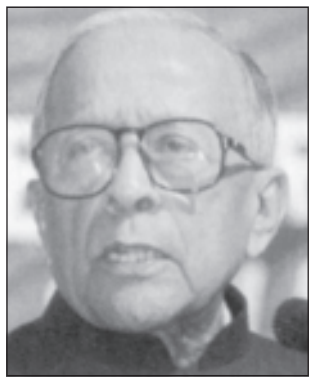

যায়নি। কিন্তু মমতা ব্যানার্জি শেষ যাত্রায় শ্রদ্ধা জানাতে আসেননি। যদিও জ্যোতিবাবু তাঁকে একান্তে বলেছিলেন "আমাদের শেষ আপনাদের শুরু"। এই লেখা একটি বাজারি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

জ্যোতি বসু ২৩ বছর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। এই ২৩ বছরে তাঁর কাজের কৃতিত্ব হিসাবে ভূমিসংস্কার এবং পঞ্চায়েত কাজ-এর উল্লেখ করা হয়। এ-কাজ তো তদানীন্তন-মন্ত্রী বিনয় চৌধুরীই ছিলেন প্রধান স্থপতি। এই বিনয়বাবুকে জ্যোতিবাবু মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিতে বলেছিলেন—কারণ বিনয়বাবু প্রমোটার সরকার বলে ছিলেন।

জ্যোতিবাবুর জমানাতেই মরিচঝাঁপিতে পুলিশি তাণ্ডব হয়, বানতলা থেকে শুরু করে ২১ শে জুলাই পুলিশি তাণ্ডব হত্যা চলে। বানতলাতে মহিলা খুন হলে জ্যোতি বসু বলেছিলেন "এরকম ঘটনা বহু ঘটে।"

২৩ বছরের মুখ্যমন্ত্রিত্বে শিল্পায়ন হয়নি। ২৩টি বন্ধ কারখানা খোলা যায়নি। ২৩ শত নতুন কর্মসংস্থান হয়নি। শিল্পায়নের নামে শুধু "মউ" স্বাক্ষর আর সোমনাথ চ্যাটার্জি বিদেশ গমন হয়েছিল। রাজ্যের কোনও উন্নতি হয়নি। জ্যোতি বসু এসব কাজের ঝুঁকি নিতে চাননি। "থোড় বড়ি খাড়া খাড়া বড়ি থোড়"—এই ভাবে মন্ত্রিত্ব কাটিয়ে গেছেন। ২৩ বছরে রাজ্যের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল। জ্যোতিবাবুর কোনও উদ্বেগ ছিল বলে জানা নেই।

জ্যোতিবাবুর আমলেই ডঃ শঙ্কর সেনের মতোন দক্ষ ব্যক্তি বিদ্যুৎমন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করে রাজনীতি ছেড়ে দেন। ডঃ অশোক মিত্রের চলে যাওয়া তো সর্বজনবিদিত। এমনকী বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্যও মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে জ্যোতিবাবুর বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করেছিলেন। জ্যোতিবাবুকে সমালোচনা করার অপরাধে যতীন চক্রবর্তীকে জ্যোতিবাবুর চাপে আর এস পি পার্টি থেকে বহিষ্কার করে ছিল! কী আশ্চর্য এই জ্যোতিবাবু আর যতীনবাবুকে লোকে "কিউ ইউ" বলতেন। তবে এই কথাগুলি লেখার মানে জ্যোতি বসু-কে হেয় করার চেষ্টা নয়। আজ রাজ্যের বেশ কিছু মানুষের মনে এসব কথা উঠছে এবং উঠবেই। এবং তাঁর কাজের ফলেই পার্টি তাঁর স্থলে বুদ্ধ দেবকে মুখ্যমন্ত্রী করেছিল। বুদ্ধ দেব-নিরুপম এক ভয়ানক রাজ সৃষ্টি করেছেন—তার বিশদ বহু লেখায় এখানে বলা হয়েছে। সেইসব একচেটিয়া বিদেশী-পুঁজির বান্ধব বুদ্ধ -নিরুপম রাজ্যে এক ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি করে মাওবাদী শক্তিকে বাড়িয়ে তুলেছে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম লালগড় তারই প্রমাণ। এর ফলে শুধু রাজ্যে নয় সমগ্র ভারতের বাম আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ-সবই জ্যোতিবসুর জমানায় নেতিবাচক বা স্থবিরত্বের ফল এবং প্রতিক্রিয়া—এটা অনস্বীকার্য। কমিউনিস্টদের সাধাসিধে জীবনযাত্রা সম্পর্কে আমরা যা দেখেছি—তা'হল ভূপেশ গুপ্ত, বিনয় চৌধুরীদের। জ্যোতিবাবু সম্পর্কে বলা যায় না তিনি খুব সাদাসিধে থাকতেন। ১৯৫২ সালে বিধান সভায় জ্যোতিবাবু নির্বাচিত হওয়ার পর জনৈক শিল্পপতি যাঁদের একজন বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন—এসেই জ্যোতিবাবুকে ব্যবহারের জন্য একটি ফিয়াট গাড়ি দিয়েছিল। আরও আছে এই শিল্পপতিই সিটু তৈরি হবার পর সিটুর প্রথম কাউন্সিল অধিবেশন দিল্লীতে হয়েছিল। সেই কাউন্সিলে যাবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিদের ট্রেনে খাদ্য সরবরাহ করেছিল এই শিল্পপতি। একথা আমাকে বলেছিলেন আর সি পি আই নেতা সুধীন কুমার।

আর একটা কথা, জ্যোতি বসু পার্টিতে কোনও দিন "জ্যোতিদা" হতে পারেননি, তিনি "বাবু" থেকেই গেছিলেন। তিনি সাধারণ-পার্টি সদস্যদের সঙ্গে মিশতেন না। তবে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে জ্যোতিবাবুর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে তাঁকে যে-কেউই চিঠি লিখলে বা সমস্যা জানালে তিনি তার উত্তর দেবার ব্যবস্থা করতেন এবং সমস্যাটা সরকারি দপ্তরে পাঠিয়ে দিতেন। এ-ব্যাপারে বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য একেবারেই অহংকারী। তিনি কোনও চিঠির প্রাপ্তি পর্যন্ত স্বীকার করেন না।

নিরুপম সেনও তাই। জ্যোতি বসু, হরেকৃষ্ণ কোঙার ও বিনয় চৌধুরী প্রতিটি চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করতেন।

বলা হচ্ছে, জোতিবাবু বহুবার কারারুদ্ধ হয়েছিলেন সুখী জীবনের সম্ভবনাকে ত্যাগ করে—এটা ঠিক। কিন্তু জ্যোতি-বাবুদের নেতা করার জন্য পার্টির ডাকে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ দিয়েছেন, বহু পরিবারের অন্নবস্ত্র জোগাড় হয়নি। আজও বহু কর্মীর সন্তান কর্মহারা হয়ে কষ্ট ভোগ করেছেন। তাঁরা কি পেরেছে? পার্টি তিনদশক ক্ষমতায় থেকে এইসব রাজনৈতিক লাঞ্ছিতদের জন্য কি করছেন? মাসিক সরকারি ভাতা। তাঁদের পুত্র-পরিজন শেষ হয়ে গেছে। শিক্ষক আন্দোলনে নিহত শৈলেন মাস্টারের রক্তের দাগ এখনও মধ্য-কলকাতার রাস্তায় রয়েছে।

জ্যোতিবাবু রুপোর চামচ মুখে দিয়ে জন্মেছিলেন—আর রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় গ্যান স্যালুট-নিয়ে অমরাধামে চলে গেলেন। তাঁর পুত্রের বিত্তের কথা তুললাম না, বিতর্ক হবে। সাধারণ কর্মীদের ত্যাগেই জ্যোতি বসুরা নেতা হন— তারপর সাধারণ কর্মীদের কথা তাঁরাই ভুলে যান!

জ্যোতিবাবুর পৈত্রিক বাড়ি সংরক্ষণ ও বাঙালীর অধিকার হরণ

শিবাজী গুপ্ত

১৮ই জুলাই'র দৈনিক স্টেটসম্যান পত্রিকায় ঢাকা থেকে প্রেরিত এক প্রতিবেদনে বারদিগ্রামে জ্যোতিবাবুর পৈত্রিক বাড়ি সংরক্ষণ সংবাদের মাঝে উক্ত গ্রামের নাগপাড়া ও চৌধুরীপাড়ার হিন্দু বাড়িগুলির যে দৈন্যদশার খবর জানা গেল, তাতে সারা বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ পরিত্যক্ত, অধিকৃত ও জবরদখলিকৃত হিন্দু বাড়িরই ওই একই করুণ অবস্থা। হাজার হাজার গ্রাম হিন্দুশূন্য হয়ে গেছে, লক্ষ লক্ষ ভিটায় ঘুঘু চরছে বা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। দেশে শিক্ষাবিস্তার, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার, সমাজসেবা ও স্বাধীনতার জন্য যাঁরা অকাতরে নিজেদের ধনপ্রাণ বিলিয়ে দিয়েছিলেন, তেমন শতসহস্র লোকের ভিটার হদিস কিংবা সেসব সংরক্ষণের প্রচেষ্টা বা প্রয়োজনীয়তা কেউ অনুভব করে না—হয়তো করা সম্ভবও নয়।

কারণ, তা হলে তো সারা বাংলাদেশেই স্মৃতিসৌধ ও সংরক্ষিত বাড়িতে ভরে যাবে। বাংলাদেশের ১৭টি জেলায় (বর্তমানে ৬২টি) বারদির মতো বর্ধিষ্ণু ও সম্ভ্রান্ত গ্রামের সংখ্যা ও কৃতবিদ্য পুরুষদের জন্ম-ভিটার স্থান ও সংখ্যা নিরূপণ সাধ্যাতীত।

সেদিক থেকে জ্যোতিবাবু ভাগ্যবান। তাঁর এই সৌভাগ্যের পেছনে তাঁর দলের অনুসৃত রাজনীতির অবদানও কম নয়, তদুপরি বাবা লোকনাথের কৃপা তো আছেই! তিনি ও তাঁর দল চিরদিন মুসলমানদের স্বাধিকারের জন্য লড়েছেন। পাকিস্তানের দাবীতে সোচ্চার সমর্থন জানিয়েছেন। পুরো বাংলা পাকিস্তানে যাবার সওয়াল করেছেন। মুসলিম লীগের ডাকা রক্তক্ষয়ী প্রত্যক্ষ সংগ্রামে সামিল হয়েছেন। দেশভাগের পরেও মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ ও অবস্থানে দরাজ হাতে ব্যবস্থা করেছেন। এবং সর্বশেষ শেখ হাসিনার পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রীত্বকালে জ্যোতিবাবু গঙ্গার জল বণ্টনে পশ্চিমবঙ্গকে বঞ্চিত করে বাংলাদেশকে আশাতিরিক্ত জলদানে কেন্দ্রীয় সরকারকে চাপ দিয়ে বাধ্য করেছেন। তারই স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ লক্ষ লক্ষ হিন্দু-বাড়ির মধ্যে জ্যোতিবাবুর বাড়িটি সংরক্ষণে উদ্যোগী হয়েছে। কৃতজ্ঞতা বলে তো একটা কথা আছে! আবার ২১শে জুনের পত্রিকায় লিটলম্যাগ কলমে অন্য এক প্রতিবেদক লিখেছেন—"২২০ বছরের মধ্যে বাঙালি অধিকার হারিয়েছে দু'বার"। একবার ১৭৫৭-র ২২ জুন পলাশিতে এবং দ্বিতীয়বার ১৯৭৭-র ২১ জুন কলকাতায়। এই বক্তব্যের মধ্যে সত্যাসত্য মিশ্রিত রয়েছে।

ইতিহাসের বিচারে বাঙালী স্বাধিকার হারিয়েছে ৮০৩ বৎসর পূর্বে—১২০৬ খৃস্টাব্দে, যেদিন অতর্কিত তুর্কি আক্রমণে বাংলাদেশের শাসনরজ্জু বাঙালীর হস্তচ্যুত হয় এবং ইখতিয়ার-উদ্দিন-বিন্-বক্তিয়ার খিলজীর নেতৃত্বে একেশ্বরবাদী সৈনিকদল বাংলার রাজ্যপাট দখল করে বসে। এদের ধর্মান্ধতা ও অত্যাচার প্রবণতা বাংলাদেশের জনজীবনের উপর প্রচণ্ড ঝড় বইয়ে দিল। একহাতে ধর্মগ্রন্থ অপরহাতে তরবারি নিয়ে পরধর্ম অসহিষ্ণু নতুন শাসকগোষ্ঠী ও তাদের দলবল বাংলার গ্রামগ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। অশ্রুতপূর্ব ধর্মীয় জিগিরে আকাশবাতাস কেঁপে ওঠে। সম্পূর্ণ বিজাতীয়, বিসদৃশ ও আগ্রাসী ধর্ম-সংস্কৃতি ও রীতিনীতির মুখোমুখি পড়ে বাঙালী সমাজ অসহায়, বিব্রত ও বিধবস্ত হয়ে পড়ে।

দীর্ঘ সাড়ে পাঁচশ বছরব্যাপী বাঙালী

বাংলাদেশে জ্যোতিবাবুর পৈতৃকবাটি।

জীবনের এই তামস যুগের অবসান ঘটে ১৭৫৭ খৃস্টাব্দের জুন মাসে পলাশীর আমবাগানে। যদিও এক বিদেশীর হাত থেকে আরেক বিদেশীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর, তবু তা ছিল অন্ধকার থেকে মুক্তিলাভের পথে পদক্ষেপ। ঐতিহাসিকের ভাষায়ঃ

"On 23rd. June 1757, the middle ages of India ended and her modern age began. ...We crossed the frontier and entered into a great new world to which a strange destiny had led Bengal." (History of Bengal–Sir Jadunath Sarkar).

সুতরাং ১৭৫৭ খৃস্টাব্দের জুন মাসে বাঙালী অধিকার হারায়নি, বরং তাদের সামনে অধিকার সচেতনতার দুয়ার খুলে যায়। আর ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট, বাংলার দুই-তৃতীয়াংশের উপর অধিকার হারানোর কথা ভুলে ১৯৭৭-এর জুন মাসে নির্বাচনী জয়পরাজয়কে অধিকার হারানো বলা অর্থহীন অর্বাচীনতা।

এরাজ্যে গণতন্ত্রের নামে চলছে ফ্যাসিবাদী বর্বরতা

ডঃ অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

গণতন্ত্রের বুনিয়াদ গড়ে ওঠে অবাধ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু এ রাজ্যে সিপিএমের দৌরাত্ম্যে অবাধ নির্বাচন আজ প্রহসনে পরিণত হয়েছে, গণতন্ত্র আজ লুণ্ঠিত। দলদাস প্রশাসনের নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের অপারগতায় এবং সিপিএমের লাগামছাড়া সন্ত্রাসে গণতন্ত্র এ রাজ্যে ধর্ষিত। এ রাজ্যে সিপিএম যে গণতন্ত্র কায়েম করেছে তার পেছনে রয়েছে ফ্যাসিবাদের দাপট। মুসলিনি pacifism অর্থাৎ শান্তিবাদকে দূর অস্ত করে যুদ্ধ বাজের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আর এ রাজ্যে সিপিএম গণতন্ত্রপ্রেমী শান্তিপ্রিয় জনগণের যাবতীয় সাংবিধানিক অধিকার হরণ করতে অঘোষিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। ভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী বা বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শ নিরপেক্ষ জনগণের বিরুদ্ধে এই অঘোষিত যুদ্ধে এ রাজ্যের মানুষ আজ অসহায়। এ যুদ্ধের অস্ত্র হুকুম, হুমকি, হত্যা। এই ত্রিবিধ অস্ত্রের সঙ্গে আছে ঘর জ্বালানো, ধর্ষণ, বাড়ি ছাড়া-গ্রাম ছাড়া করা, ফসল লুঠ করা, একঘরে করা, সালিশি সভায় ডেকে জরিমানা ইত্যাদি করা। প্রশাসন এসব ব্যাপারে ঠুঁটো জগন্নাথ। ফ্যাসিবাদ কেন্দ্রিক-রাজনৈতিক আদর্শই হলো এইভাবে জনগণকে ভয় এবং সন্ত্রাসের মধ্যে রেখে শাসকের অনুগতজনে পরিণত করা।

গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন আজ এ রাজ্যে সর্বক্ষেত্রে সন্ত্রাস কবলিত। কলেজের ছাত্রসংসদ নির্বাচন থেকে শুরু করে স্কুলের পরিচালন সমিতি গঠনের নির্বাচন, পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে পৌরনির্বাচন এবং সর্বোপরি বিধানসভা ও লোকসভা গঠনের নির্বাচনে এ রাজ্যে গণতন্ত্র 'নীরবে নিভৃতে কাঁদে'। ফ্যাসিবাদী মুসোলিনি অনুশ্রুত facism repudiate democracy অর্থাৎ ফ্যাসিবাদে গণতন্ত্রকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার আদর্শ এ রাজ্যে তথাকথিত মার্কসবাদে দীক্ষিত সিপিএম অনুসরণ করছে। তাই এরাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ আজ নির্ভয়ে নিজের পছন্দ মতো প্রার্থীর পক্ষে তাদের গণতান্ত্রিক ভোটাধিকার প্রয়োগ থেকে বঞ্চিত। বিশেষ করে গ্রামের প্রতি ঘরে সিপিএমের হার্মাদবাহিনী বামফ্রন্টের পক্ষে ভোট দেবার হুকুমনামা জারি করে নির্বাচনের প্রাক্কালে। এদের মোটরবাইক-বাহিনী গ্রামে বাড়িতে বাড়িতে এসে ভোটের আগে হুঁশিয়ারি দিয়ে যায় তাদের নির্দেশ পালন না করলে বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হবে, ক্ষেতে চাষ বন্ধ করে দেওয়া হবে, ধোপা-নাপিত-দোকান-বাজার বন্ধ হবে; মেয়েদের বলা হয় থান কাপড় পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এ কেবল 'বাত কি বাত নয়'— অশিষ্ট গ্রামবাসীকে হাতে হাতে ফল ভোগ করার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। হাওড়া জেলার কান্দুয়ার কিছু বিরুদ্ধাচারীর হাত কেটে দেওয়া হয় হাতে হাতে ফল ভোগের নমুনা হিসাবে, ২০০১ সালের ৪ জানুয়ারী পশ্চিম মেদিনীপুরের ছোট আঙারিয়ার বক্তার মণ্ডলের বাড়ি জ্বালিয়ে গণহত্যা করা হয়, বারাসাতের নিবেদিতা পল্লীর রঞ্জনা বিশ্বাসের বাড়ির সামনে ৪০টি মাইকের চোঙ লগিয়ে স্লোগান ও কুৎসিত ভাষায় সারাদিন ধরে চিৎকার করে প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তোলা হয়। এমন দৃষ্টান্ত আরও দেওয়া যায়। ঘরছাড়া হয়ে আজও ঘুরে বেড়াচ্ছে কেশপুর, গোপীবল্লভপুর, ডেবরা ছাড়াও বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম্, হুগলীর আরামবাগ মহকুমার বহু মানুষ। খোদ কলকাতার বুকে ঘরছাড়া আনোয়ার আলি ও তার পরিবারের মতো বহু মানুষের সাক্ষাৎ মিলবে।

একত্রে বুদ্ধ-জ্যোতি

নির্বাচনী সন্ত্রাসের এই ধারাবাহিকতায় সিপিএমের ছাত্রসংগঠন এস এফ আই কলেজে কলেজে দখল রাখতে বিরুদ্ধ বাদী ছাত্রদের ওপর অত্যাচার এমনকী হত্যা করতে দ্বিধা করে না। সম্প্রতি উত্তর চব্বিশ পরগণার পাণিহাটি কলেজের নির্বাচনে এস এফ আই-এর হাতে বিরোধী ছাত্রসংগঠনের এক কর্মী নিহত হয়। নির্বাচনের গুরুত্বের মাত্রাভেদে বিরুদ্ধ বাদীর দাওয়াই নির্ধারিত হয়। ছাত্র-সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার দিন থেকেই কলেজে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে সিপিএমের ছাত্রসংগঠন এস এফ আই। এখান থেকেই এদের ট্রেনিং শুরু হয় ভবিষ্যতে বৃহত্তর রাজনীতিতে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে রিগিং করে নির্বাচনে জয় সুনিশ্চিত করার। ১৯৫২ সাল থেকে বাইরের লোক এনে নির্বাচন করার সিপিএমের পরম্পরাগত তত্ত্বের প্রয়োগ করা হয় ছাত্রসংসদ নির্বাচনেও। ফ্যাসিবাদী কায়দায় নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করতে বিরুদ্ধ পক্ষের প্রার্থীদের কলেজ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া আটকানোর জন্য রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটানো হয়। প্রার্থীর বাড়িতে গিয়ে লোকাল পার্টির মাধ্যমে চাপ দেওয়া হয়। ছাত্রী-প্রার্থীদের বাড়িতে হানা দিয়ে তার মা-বাবাকে মেয়ের ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিয়ে আসা হয়। এর পরেও দুঃসাহসী হলে তাকে দৈহিক নিপীড়নমূলক দাওয়াই দিয়ে সহবত শেখানো হয়। পঞ্চায়েত, পৌর এবং বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে আরও পরিকল্পিত দাওয়াই দিয়ে বিরুদ্ধ বাদীর একপ্রকার বিশেষ অর্থে বাবার নাম ভুলিয়ে দেওয়ার মতো অত্যাচার করা হয়। Ultimate goal যেখানে তখতে তাউসে অধিকার কায়েম রাখা সেখানে বিরুদ্ধ বাদীদের ওপর প্রাণ সংশয়ের শেষ অস্ত্র প্রয়োগেও এরা কুণ্ঠিত হয় না। এদের বিচারে বিরুদ্ধ বাদী মাত্রই শ্রেণীশত্রু এবং তাদের নিকেশ না করলে জ্যোতি বসুর মতো মৃত্যুঞ্জয়ী মহাশাসকের ঐতিহ্য ধরে রাখবে কী করে! তাই তো মহান্ নেতা জ্যোতিবাবু মরিচঝাঁপিতে ১৯৭৯ সালে উদ্বাস্তুদের রক্তে মাতলা নদী রাঙিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর কমরেডরা সেই মহাজনের পথ অনুসরণ করে ১৯৮২ সালে বিজন সেতুর ওপর ১৬ জন আনন্দমার্গীকে দিনদুপুরে পুড়িয়ে মারে, ১৯৯০ সালে তিলজলায় অনীতা দেওয়ান, রেণু ঘোষ, উমা ঘোষ প্রমুখ চিকিৎসাকর্মীদের ওপর বলাৎকার করে হত্যা করে, ২০০১ সালে পশ্চিম মেদিনীপুরের ছোট আঙারিয়ায় বাড়িসমেত গরীব গ্রামবাসীদের পুড়িয়ে মারে, ২০০২ সালে নানুরের সুচপুরে ১১ জন গরীব চাষিকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। আজও একটা অপরাধেরও মহান্ নেতার জীবৎকালে বিচার হল না 'though he is an honourable man'। সেই ধারবাহিকতা অনুসরণ করে তাঁর উত্তরসূরী বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য নন্দীগ্রামে গণহত্যার পর 'সূর্যোদয়' ঘটালেন, সিঙ্গাপুরের কৃষি জমিও কৃষকদের ধ্বংস করে শিল্পপতি টাটার সেবাদাস হয়ে বিপ্লবের পথ প্রস্তুত করলেন আর এই মহান্ নেতাদের চেলাচামুণ্ডারা জেল ফেরৎ আসামী হয়েও দিব্যি মন্ত্রীত্ব করে, সাংসদ হয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার হয়ে বুক ফুলিয়ে সমাজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমের শাসনে গণতন্ত্রের এই চেহারা। ফ্যাসিবাদের সঙ্গে এর আর তফাৎ কোথায়? ফ্যাসিস্ট আদর্শে গঠিত রাষ্ট্রের যে রূপ কার্লাইল তুলে ধরেছেন সেই

(এরপর ১৩ পাতায়)

আবশ্যিক ভোট

গুজরাট সরকারের অভিনন্দনযোগ্য পদক্ষেপ

অধ্যাপক শিবরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

প্রায় এক দশক আগে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচনে জনৈক নির্বাচন প্রার্থীর সঙ্গে আমি নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়েছিলাম। একটা বহুতল বাড়ীতে গেলাম। প্রায় ৮০টা ফ্ল্যাট। প্রায় সমস্ত ফ্ল্যাটেই দরজা খুলে ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা প্রচারপত্র নিলেন এবং হাসিমুখে বললেন—"নিশ্চয়ই ভোট দেব"। একটি ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে আমাদের অন্যরকম অভিজ্ঞতা হল। প্রচারপত্র নিলেন না। মুখের উপর বললেন—"ভোট দেব না।" প্রার্থী তো হতবাক্। আমি শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করলাম—'আপনি কি আমাদের প্রার্থীকে ভোট দেবেন না নাকি কাউকেই ভোট দেবেন না?" ভদ্রমহিলা বললেন—তিনি কাউকেই ভোট দেবেন না, কারণ কোনও প্রার্থীই কথায় ও কাজে একমুখ নন। ভোটের আগে এক কথা বলেন, পরবর্তীকালে হয় সে কাজ করেন না অথবা উল্টো কাজটা করেন। ভদ্রমহিলাকে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করলাম, তিনি যদি ভোটকেন্দ্রে না গিয়ে থাকেন, তাহলে তার ভোট আর কেউ দিয়ে দেবেন, যেটা আমাদের রাজ্যে ব্যাপকভাবে হয়ে থাকে। ভদ্রমহিলা অপ্রিয় সত্য কথা বলেছেন। ওই ভদ্রমহিলার কথা অনেকেরই মনের কথা। কিন্তু মুখ ফুটে অধিকাংশ মানুষ বলেন না। রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের সাধারণ মানুষের বড়ো অংশ ভয়ের চোখে দেখেন।

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানের অংশ হিসাবে ভারত সরকারের উদ্যোগে কলকাতায় নির্বাচনী সংস্কারের উপর দু' দিনের জাতীয় সেমিনার হয়েছিল। আলোচনার সময় ভোটদানে ভোটারদের উদাসীনতার কথা অনেকেই বলেছিলেন। ভোট দানের হার সন্তোষজনক নয়, এটা বাস্তব সত্য। এই প্রবন্ধকার লক্ষ্য করেছেন, কলকাতার বস্তি অধ্যুষিত অঞ্চলে ভোটের দিন একটা উৎসবের মেজাজ। বস্তির লোকেরা, মেয়ে-পুরুষ নির্বিশেষে, ভোট দিতে যাচ্ছেন, এটা দর্শনীয় বিষয়। কিন্তু বহুতল বিশিষ্ট ফ্ল্যাট বাড়ীর বাসিন্দাদের ভোট দিতে বড়োই অনীহা। ভোটদান যেমন অধিকার, তেমনি কর্তব্যও বটে। নাগরিকরা যদি তাঁদের কর্তব্য পালন না করেন, সেটা নিশ্চয়ই শাস্তিযোগ্য অপরাধ। নির্বাচনী সংস্কারের জন্যে সরকারি ও বেসরকারিস্তরে গঠিত সমস্ত কমিটি ভোটদানকে শুধু অধিকার নয়, কর্তব্য হিসাবেও বিবেচনা করবার সুপারিশ করেছে। কিন্তু এই বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলি এখনও একমত হতে পারেনি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে গুজরাট বিধানসভায় উত্থাপিত স্থানীয় প্রশাসন বিল (সংশোধনী) বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই বিলটি আইনে পরিণত হলে পঞ্চায়েত, পুরসভা এবং পুর-নিগমের নির্বাচনে ভোটারদের ভোটদান বাধ্যতামূলক হবে। বিলটি আমি পাইনি। তবে নানা সংবাদসূত্র থেকে যে খবর পাওয়া গিয়েছে, তার ভিত্তিতে বিলের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করছি।

নরেন্দ্র মোদী

(১) সমস্ত ভোটার পুরসভা, পুর-নিগম এবং পঞ্চায়েত ভোটে ভোট দিতে বাধ্য থাকবেন। (২) ভোট না দিলে অপরাধী সাব্যস্ত হবেন এবং আইন অনুযায়ী শাস্তি পেতে হবে। (৩) কেন তিনি ভোট দেননি, তা সংশ্লিষ্ট ভোটারের কাছে জানতে চাওয়া হবে এবং কারণ অবশ্যই যুক্তিগ্রাহ্য হতে হবে। জবাবদিহি করার জন্য এক মাস সময় দেওয়া হবে। (৪) ভোট না দেওয়ার অপরাধে শাস্তি থেকে একমাত্র তাঁকেই রেহাই দেওয়া হবে যদি তিনি অসুস্থ থাকেন বা শারীরিকভাবে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে অসুবিধা বোধ করেন অথবা বিশেষ প্রয়োজনে রাজ্যের বাইরে থাকেন। (৫) ব্যালট পেপারে নেতিবাচক ভোটের ব্যবস্থা আছে। এটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ভোটার যদি কোনও প্রার্থীকেই যথোপযুক্ত মনে না করেন, তা হলে "এদের কাউকে নয়" বোতাম টিপে তাঁর মতামত ব্যালট বন্দি করতে পারেন। (৬) নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রত্যাহার (recall) করে নেবার অধিকারও ভোটারদের দেওয়া হয়েছে। নির্বাচিত হওয়ার পর দু'বছর অতিক্রান্ত হলে যদি ভোটারদের এক-তৃতীয়াংশ জেলাশাসকের কাছে কোনও নির্বাচিত প্রার্থীর বিরুদ্ধে এই মর্মে ডেপুটেশন দেন যে সংশ্লিষ্ট প্রার্থী অপদার্থ, অযোগ্য বা দুর্নীতিগ্রস্ত, এবং তদন্তের পর জেলাশাসক অভিযোগের সত্যতা আছে মনে করেন, তা হলে সংশ্লিষ্ট নির্বাচিত প্রতিনিধিকে জেলাশাসক অপসারণ করতে পারেন ও পুনরায় নির্বাচনের আদেশ দিতে পারেন।

এই প্রবন্ধের প্রথমেই আমরা দেখেছি, কম হারে ভোট হওয়ার কারণ শুধুমাত্র ভোটারদের উদাসীনতা নয়, তাঁদের হতাশা, তাঁরা কোনও প্রার্থীকেই যোগ্য মনে করছেন না। অথচ ই. ভি. এম. যন্ত্রে 'কাউকেই সমর্থন করছিনা' এই ধরনের কোনও ব্যবস্থাই নেই। মনে পড়ছে, ২০০৪ এর অক্টোবরে নয়াদিল্লীতে ভারতীয় গণ-প্রশাসন সংস্থার উদ্যোগে নির্বাচন সংস্কারের উপর আয়োজিত এক সম্মেলনে তৎকালীন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার কৃষ্ণমূর্তি বলেছিলেন, ভোটাররা ইচ্ছা করলে যাতে সমস্ত প্রার্থীকে অপছন্দের কথা জানাতে পারেন, সেই ব্যবস্থা ই. ভি. এম. যন্ত্রে রাখবার জন্য নির্বাচন কমিশন চিন্তা-ভাবনা করছে। অবশ্য এখন পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি। এই দিক্ থেকে দেখলে গুজরাট বিধানসভার পদক্ষেপ নিশ্চয়ই বিপ্লবাত্মক। তবে একটা বিষয়ে সংশয় থেকে যাচ্ছে। ভোটারদের এক-তৃতীয়াংশ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালে অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে কে তদন্ত করবেন—জেলাশাসক নিজে অথবা কোনও নিরপেক্ষ সংস্থা? যদি তদন্তের দায়িত্ব জেলাশাসককে দেওয়া হয়, সেটি গণতান্ত্রিক বিধিসম্পন্ন হবে কিনা সন্দেহ। গণতন্ত্রে সরকারি আধিকারিকদের হাতে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাজ ও আচরণ মূল্যায়ন করার ক্ষমতা থাকা উচিত নয়।

রাজ্যস্তরের নিরপেক্ষ সংস্থাকে দিয়ে তদন্ত করাটাই গণতান্ত্রিক রীতিসম্মত। সেই তদন্ত সংস্থা অবশ্যই সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীর

(এরপর ১৩ পাতায়)

গণতন্ত্র ঃ জনপ্রতিনিধিদের ফিরিয়ে আনার অধিকার

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

সম্প্রতি জনপ্রতিনিধিদের ফিরিয়ে আনার ব্যাপারটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জন দাবীতে পরিণত হয়েছে। অনেকেই মনে করেন, এই ক্ষমতাটা নির্বাচকদের হাতে থাকাটা একান্ত জরুরী। কারণ তাঁরাই ভোট দিয়ে সাংসদ ও বিধায়কদের আইনসভায় পাঠান। সেক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে, তাঁদের কেউ কেউ জনসাধারণের প্রতি কর্তব্য পালনে অনিচ্ছুক বা প্রতিশ্রুতি-রক্ষায় অপারগ, তাহলে তাঁদের সরিয়ে দিয়ে অন্য ব্যক্তিদের আইনসভায় পাঠানোর ক্ষমতা ভোটারদের হাতে থাকা দরকার। তাহলেই জনপ্রতিনিধিরা সচেতন হবেন। শাসনব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রেরও ছাপ পড়বে। এই ধরনের ব্যবস্থা সুইজ্যারল্যাণ্ডে আছে এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের সংবিধানেও ছিল।

সুইজারল্যাণ্ডের অন্তত দুটো ক্যান্টনে (আমাদের অঙ্গরাজ্যের মতো) এই ব্যবস্থা চালু আছে—অন্যগুলোতে অবশ্য প্রতিনিধিদের কার্যকাল তিন/চার বছরের জন্য নির্দিষ্ট (ও. পি. গোয়েল—কম্পারেটিভ গভর্নমেন্টেস্, পৃঃ ৩৪১)। কিন্তু দুটো ক্যান্টনে প্রতিনিধিদের কার্যকাল শেষ হওয়ার আগেই ভোটররা তাঁদের ফিরিয়ে দিতে পারেন—এটা হতে পারে যে-কোনও সময়। ডঃ এ. সি. কাপুরের ভাষায়—'before the expiration of their term—(সিলেক্ট কন্‌স্টিটিউশান্স, পৃঃ ৫৩৯)।

এই ব্যবস্থাটা সোভিয়েট রাশিয়ায় লেনিনের আমলেই বিপ্লবোত্তর ব্যবস্থা হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। 'স্ট্যালিন-সংবিধান' (১৯৩৬) গৃহীত হওয়ার আগের দশকে অন্তত ৪০০ জন জনপ্রতিনিধিকে এভাবে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছিল বলে বরিস্ টপরনিন্ জানিয়েছেন—(দ্য নিউ কন্‌স্টিটিউশান অফ দ্য ইউ. এস. আর., পৃঃ ১৭২—৭৩)। এই ব্যবস্থা স্ট্যালিন-সংবিধানেও রাখা হয়েছিল। একটা কেন্দ্রের ভোটারদের সকলে চাইলে সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিকে বিদায় নিতে হোত।

আমাদের সংবিধান কিন্তু এই ধরনের কোনও ব্যবস্থা রাখেনি। কেন্দ্র ও রাজ্যের আইনসভার সদস্যরা এই ধরনের ব্যক্তি-নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তাঁরা নির্ধারিত সময়ের জন্য নির্বাচিত হয়ে থাকেন—দীর্ঘ অনুপস্থিতি, একাধিক কক্ষে প্রতিনিধিত্ব লাভ ইত্যাদি কিছু সুনির্দিষ্ট কারণেই তাঁদের সদস্যপদ খারিজ হতে পারে—কিন্তু ভোটাররা তাঁদের ফিরিয়ে নিতে পারেন না।

'রিকল', 'ইনিসিয়েটিভ', 'রেফারেণ্ডাম্' ইত্যাদি ব্যাপারগুলো সুইজারল্যাণ্ডে আছে বলে লর্ড ব্রাইস মন্তব্য করেছেন যে, সেই দেশে রয়েছে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের নীতি—'ডাইরেক্ট ডেমোক্র্যাসী ইন প্রোজেক্ট।' কিন্তু আমাদের দেশে আছে পরোক্ষ গণতন্ত্র—ভোটাররা শুধু ভোটের দিনের সম্রাট, ভোট দেওয়ার পর তাঁদের আর কোনও কিছু দাম নেই, স্বামীজীর ভাষায় তাঁরা তখন 'ভেড়া'।

হায় গণতন্ত্র !

সাহাবুদ্দিন

পাপ্পু যাদব

এটা লক্ষণীয় যে, আমাদের সংবিধান বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন উপাদান গ্রহণ করেছে। রচয়িতাদের লক্ষ্য ছিল তিল-তিল করে এক নতুন তিলোত্তমা সৃষ্টি করা। এই সংবিধানের উপাদানগুলোর কিছু দেশীয় হলেও অনেকগুলোই বিদেশী—'These are both indigneous and foreign—(ডঃ এস. সি. কাশ্যপ—আওয়ার কন্‌স্টিটিউশান, পৃঃ ৩)। তবে বলা দরকার—তার মূল কাঠামোটা বৃটিশ ধাঁচের। তার ওপরেই নানা দেশের নানা রঙ লাগানো হয়েছে মাত্র। যেমন 'নির্দেশমূলক নীতি'র অধ্যায়টা আয়ারল্যাণ্ডের প্রেরণায় সন্নিবিষ্ট হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এসেছে কানাডার ছাপ, রাজ্যসভা গঠনের ব্যাপারে বৃটেন ছাড়াও অষ্ট্রেলিয়ার প্রভাব পড়েছে, ব্যক্তি স্বাধীনতার ফলে যে 'procedure established by law' কথাগুলো রাখা হয়েছে (২১নং অনুচ্ছেদ), তার উৎস জাপানের সংবিধান, জরুরী অবস্থা-সংক্রান্ত ব্যবস্থাটা মনে করিয়ে দেয় প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর জার্মানীর 'ভাইমার সংবিধান'-এর (weimar consti-tution) কথা। এভাবে বিশ্লেষণ করে দেখানো যায় যে, ভারতীয় সংবিধান বহু বিদেশী সূত্রের যোগফল।

কিন্তু, বিস্ময়ের বিষয়—সুইজারল্যাণ্ড ও সোভিয়েট রাশিয়ার 'রিকল'—বিষয়টা আমাদের সংবিধান আদৌ গ্রহণ করেনি, যদিও নির্বাচিত ব্যবস্থাকে প্রকৃত 'গণতন্ত্র' রূপে পরিণত করার ব্যাপারে এর অত্যন্ত দরকার ছিল।

এটা লক্ষণীয় যে, আমাদের জনপ্রতিনিধিরা বিপুল অর্থ ও নানা ধরনের সুযোগ সুবিধে পান তাঁদের কর্তব্য পালনের জন্য যেগুলো তাঁরা নিজেরাই নির্ধারণ করেন—তার জন্য। কোনও বেতন কমিশনের দরকার হয় না। একটা হিসেবে দেখছি—সাংসদরা মাসে অন্তত দুই লাখ টাকা বেতন, ভাতা ও সুবিধে অর্থমূল্যে পেয়ে থাকেন, বিধায়কদের আয়ও কম নয়। সুতরাং বলা যায়—তাঁদের দেশের সর্বোচ্চ বেতনভোগীদের মধ্যে অনায়াসেই রাখা যায় (বর্তমান লোকসভায় ৫৪৩ জন সদস্যের মধ্যে ৩০৬ জনই নাকি কোটিপতি, মন্ত্রীসভার ৬৪ জনের সম্পত্তির পরিমাণ ৫০০ কোটিরও বেশি)!

তাঁরা সবাই দুধে-ভাতে থাকুন—আমাদের তাতে কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু প্রশ্নটা হল—বিনিময়ে সাধারণ মানুষ কি পান?

ভি. ঈশ্বর আনন্দ মন্তব্য করেছেন যে, পার্লামেন্টের কর্মক্ষমতা ও আলোচনার মান ক্রমে নিম্নমুখী হয়ে চলেছে। তাঁর মতে, এর পূর্ব-গৌরব এখন আর নেই—('পার্লামেন্ট অ্যাট ওয়ার্ক-দ্য স্টেটস্‌ম্যান, ২০.০২.৮৬)। তার কারণ সম্ভবত সদস্যদের গুণগত মানের অবনতি। স্বাধীনতার পর কয়েক দশক ধরে কিছু গুণী ও দক্ষ রাজনীতিবিদ পার্লামেন্ট ও রাজ্য বিধানসভায় ছিলেন—তাঁরা উচ্চাঙ্গের আলোচনার মাধ্যমে অধিবেশনগুলোকে প্রাণবন্ত ও সার্থক করে তুলতেন বলে প্রাক্তন সাংসদ রেণুকা রায় তাঁর স্মৃতিকথায় ('মাই রেমিনিসেন্সেস') মন্তব্য রয়েছেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, পরবর্তীকালে অবস্থার বেশ পরিবর্তন ঘটেছে—এখন সেই স্বর্ণযুগ আর নেই। ডঃ এস. এল. সিক্রি জানিয়েছে—এখন বিতর্ক আর আলোচনা প্রাথমিক স্কুলের বিতর্ক-সভাকে হার মানায়—'These are worse than a primary school debate'—(ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃঃ ১৮৪)। অনেক স্পীকারও বিরক্ত হয়ে জানিয়েছেন যে, অধিকাংশ সদস্যই হোম্-ওয়ার্ক' করে আসেন না, ফলে মামুলী

(এরপর ১০ পাতায়)

গণতন্ত্র ঃ জনপ্রতিনিধিদের ফিরিয়ে আনার অধিকার

(৯ পাতার পর)

বিতর্কের মাধ্যমেই সময় কাটাতে হয়। কোনও কোনও সদস্য নাক ডেকে ঘুমিয়েছেনও।

কিন্তু সেটা অন্য কথা—গুণী মানুষদের অভাব ঘটলে যে কোনও আলোচনা সভার মানের অবনতি হতে বাধ্য। কিন্তু চিন্তার কথা হলো—অনেকের আচরণও যেন অন্য ধরনের হয়ে যাচ্ছে। হৈ-চৈ, গালিগালাজ, ওয়াক-আউট, চিৎকার, ধস্তাধস্তি ইত্যাদি আমাদের আইনসভাকে প্রায়ই কলুষিত করে তোলে। কেউ কেউ ওয়েলে নেমে আসেন, কেউ কাগজপত্র ছিঁড়ে ফেলেন, কেউ স্পীকারের 'মেস্' কেড়ে নেন। এক এক সময় প্রতিনিধিসভা মেছো-হাটে পরিণত হয়। ডঃ বি. সি. রক্ষিত মন্তব্য করেছেন, অনেক ক্ষেত্রে সদস্যদের আচার-আচরণ নিন্দনীয় হয়ে ওঠে—'Often the behaviour of the members become deplorable'—(ডেমোক্র্যাটিক কনস্টিটিউশান অফ ইন্ডিয়া, পৃঃ ১০৭)। এই সব কারণে কোনও কোনও স্পীকার বিরক্ত হয়ে পদত্যাগ করতেও চেয়েছেন, বারবার কেউ কেউ সর্বদলীয় মিটিং ডেকে সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছেন।

কিছুদিন আগে পড়েছিলাম—লোকসভা চালানোর জন্য ঘণ্টায় ১৪ লক্ষ, ৭৭ হাজার, ৯৩১ টাকা লাগে। তাছাড়া সেই সঙ্গে রাজ্যসভা এবং বিভিন্ন রাজ্য আইনসভায় (কয়েকটা আবার দ্বিকক্ষ-বিশিষ্ট) কাজও চালাতে হয়। এর অর্থ হলো—এই প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থার জন্য খরচ হয় কোটি-কোটি টাকা। অথচ গণ্ডগোলের জন্য বারবার এগুলোর অধিবেশন মুলতুবী রাখতে হয়, কখনও কখনও অনির্দিষ্টকালের জন্যও ছক্সবদন্ন্দ্ব স্তুনন্দ্বক্সগ্ন বন্ধ করে দিতে হয় সভাকে।

অনেক ক্ষেত্রে রাজ্যপালকেও অধিবেশনের সময় ভাষণ দিতে দেওয়া হয়নি—পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যপাল ধর্মবীরকে পেছনের দরজা দিয়ে বেরোতে হয়েছিল ১৯৬৭ সালে। মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল একবার কয়েকজন বিশৃঙ্খলাকারী সদস্যকে কক্ষ থেকে বহিষ্কৃত করেছিলেন। বিগত লোকসভার দশজনকে সাসপেন্ড করতে হয়েছিল। একজন অন্যদের নাম বদলে বিদেশে পাঠাচ্ছিলেন। অন্য নয়জন টাকা নিয়ে সংসদে প্রশ্ন তুলতেন।

সবচেয়ে পীড়াদায়ক ব্যাপার হলো কোনও কোনও সদস্যের নিস্পৃহ ভাব। অনেকে উপস্থিত থাকেন না, কেউ কেউ আবার উপস্থিত থাকলেও মুখ খোলেন না। কিছুদিন আগে লোকসভার শীতকালীন অধিবেশন শেষ হয়েছে। ২১ দিনের মধ্যে রাজ্যসভা ও লোকসভার কাজ চলেছে যথাক্রমে মাত্র ১০৬ ও ১০২ ঘণ্টা। তাতে লোকসভায় উপস্থিতির হার ছিল ৬৬ শতাংশ, আর রাজ্যসভায় ৬৮ শতাংশ। অনেক সময় মন্ত্রীর উত্তরদানের সময় প্রশ্নকর্তাই থাকেন না। পরেও লক্ষণীয় বিষয়—এতে অনেক জরুরী বিষয় উঠলেও মাত্র ৪৮ শতাংশ সাংসদ যোগ দেন বিতর্কের শেষ পর্বে। আর যে ৫২ শতাংশ সাংসদ যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের ২৫ শতাংশ অংশ নিয়েছেন একটা-দুটো বিষয়ে। প্রশ্নোত্তর-পর্বে অর্ধেক সদস্যই মুখ দেখিয়েছেন, কিন্তু মুখ খোলেননি। অথচ সদস্যদের দায় আরও বেড়ে যায় সঙ্কট লগ্নে—আস্থা-অনাস্থার ভোটের সময়। তখন বেশ লেনদেনের ব্যাপার চলে।

একটি সময় বিধায়ক কেনাবেচা চলত। ১৯৬৭-র এপ্রিল থেকে ১৯৬৯-র এপ্রিল পর্যন্ত ৫০০ জন বিধায়ক দল বদল করেছিলেন—মোট সংখ্যাটা ছিল ১০০০। কোটি কোটি টাকার তখন লেনদেন চলেছিল। এর ফলে ষোল মাসে ওড়িশায় ষোলটা সরকারের উত্থান-পতন ঘটেছিল। হরিয়ানার ৭৯ জন বিধায়কের মধ্যে ৪০ জনই দল ছেড়েছিল ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থে। এই যেখানে অবস্থা, সেখানে সংবিধান সংশোধন করে ভোটারদের হাতে প্রতিনিধির 'রিকল'-এর ক্ষমতা দেওয়া উচিত নয় কি? গণতন্ত্র তো জনগণের সরকার—রাজনীতি-ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সিদ্ধি র প্রতিষ্ঠান নয়।

যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দ ও হিন্দু মিলন মন্দির

বাসুদেব পাল।। রত্নপ্রসবিনী ভারতমাতা। আর ঊনবিংশ শতাব্দীতে সেই ভারতমায়ের কোল আলো করে এসেছেন অনেক মহামনীষী, সাধু-সন্ত সন্ন্যাসীরা এরকমই এক যুগাচার্য সন্ন্যাসী স্বামী প্রণবানন্দ। না, একবারে প্রণবানন্দ হননি তিনি। ধাপে ধাপে যুগসমীক্ষা করে হিন্দুজাতিকে নবজীবন, নবচেতনা, নবপ্রেরণা প্রদান করেছেন। যুগের সমস্যা সমাধানের পথ বাতলেছেন। জাতিগঠন, দেশগঠন, সমাজ সংগঠন, মহাজাগরণ, মহামিলন, মহাসমন্বয়, মহামুক্তি। জাতিকে উত্তরণে উদ্বুদ্ধ হতে পথ প্রদর্শন করে গেছেন। সেজন্য তিনি যুগাচার্য। সবার প্রণম্য—স্বামী প্রণবানন্দ। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংগঠনের নাম ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ। মন্ত্র দিয়েছেন, তন্ত্রও দিয়েছেন। জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তৈরি করে গিয়েছেন একদল সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। যাঁরা সঙ্ঘের সংগঠনের প্রাণ, ভিত্তি, আত্মা। সংগঠনই যাঁদের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান, দিবারাত্রির সাধনা, সমাজ সংগঠনই তাঁদের একমেব চিন্তা-ভাবনা। সাধারণ মানুষ বাইরে থেকে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ সম্বন্ধে বলেন—ওই তো সাধুরা কোনও বিপদ-আপদে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মানুষকে সেবা করেন, খাদ্য-বস্ত্র-পানীয় দিয়ে। আবার কেউ বা বলেন, ওই স্বামীজীরা দারুণ ভাষণ দেন।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মতো কোনও সংগঠনকে জানতে গেলে একটু ভিতরে প্রবেশ করতে হয়। তবেই প্রকৃত উদ্দেশ্য, কর্মপদ্ধতি জানতে পারা যায়। প্রথমেই জানতে হবে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ কী বলে গেছেন। তিনি বলেছেন, 'সঙ্ঘ শক্তি কলৌ যুগে।'

"সঙ্ঘ-সাধনাই যুগের সাধনা। সংহতিই অভ্যুদয়ের ও মহাশক্তি আবির্ভাবের যন্ত্র। হিন্দুর বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, অর্থ আছে, ব্যক্তিগত শক্তি-সামর্থ্যও যথেষ্ট আছে। কিন্তু নাই কেবল সংহতি-শক্তি। এই সংহতি-শক্তি জাগাইয়া দিলে হিন্দু জাতি অজেয় হইয়া দাঁড়াইবে।" দীর্ঘ পরাধীনতার ফলে আত্মবিস্মৃত হিন্দুজাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, দুর্বলতা, ভীরুতা, কাপুরুষতা, সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা মহাপাপ। আত্মবিস্মৃতিই মহামৃত্যু। মহাপুণ্য হ'ল—বীরত্ব, পুরুষত্ব, মনুষ্যত্ব ও মুমুক্ষুত্ব। ত্যাগ, সংযম, সত্য, ব্রহ্মচর্যই 'ধর্ম'।

দেশের সমসাময়িক পরিবেশ পরিস্থিতি, নিকট এবং সুদূর ভবিষ্যৎ আচার্যদেবের দিব্য দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়েছিল। সেজন্যই তিনি এক যুগান্তকারী সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে বলেছিলেন, "মিলন, সখ্য, সহযোগিতা হয়

।। স্বামী প্রণবানন্দের জন্মদিন উপলক্ষে প্রকাশিত।।

সমানে সমানে, সবলে সবলে, সবলে দুর্বলে কদাচ নয়। মুসলমান সঙ্ঘবদ্ধ সুগঠিত; খৃস্টান সুরক্ষিত;হিন্দুই অসংগঠিত। দুর্বল, আত্মরক্ষায় অক্ষম। হিন্দু যেদিন মুসলমান-খৃস্টানের ন্যায় সঙ্ঘবদ্ধ, শক্তিমান ও সুরক্ষিত হয়ে দাঁড়াবে, মিলন হবে—সেই দিন, তৎপূর্বে নয়, নয়।"

একটু সময়ের দৃষ্টিতে সমসাময়িক ভারতের দিকে—দৃষ্টি দেওয়া যাক। আমরা রোজ খবরের কাগজ খুললে কি দেখছি? রাজনৈতিক হিংসা, হানাহানি। মাতৃজাতির লাঞ্ছনা, দেশের বিভিন্ন শহরে নিরপরাধ নির্দোষ মানুষের জঙ্গি-জেহাদিদের হিংসার বলি হওয়ার ঘটনা। হিন্দু ধর্মস্থান—শ্রীরাম জন্মস্থান মন্দির, রঘুনাথ মন্দির (জম্মু), অক্ষরধাম মন্দির (গুজরাট), আত্মঘাতী জঙ্গি-জেহাদিদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল। হিন্দুসমাজ সংগঠিত না থাকার কারণে—ভারতের এক প্রদেশ থেকে লক্ষাধিক সংখ্যায় হিন্দুরা ভারতেরই অন্য প্রদেশে পালিয়ে আসছে। আর যারা দণ্ডমুণ্ডের কর্তা তারা অন্য সমাজের বেলায় যতটা দ্রুত এবং যত বেশি করে প্রতিষ্ঠাদানে, ত্রাণে তৎপর—হিন্দুদের বেলায় তার এক ভাগও নয়। এমনকী এই পশ্চিমবঙ্গেও সীমান্ত সংলগ্ন গ্রাম থেকে হিন্দুরা জমি-ঘর-বাড়ি বাজারদরের থেকে অনেক কম দামে বিক্রি করে অথবা পরিত্যাগ করে শহরে চলে আসছেন। এসবের নিদান দিয়ে গিয়েছেন যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দ। যত দিন যাচ্ছে ততই এর প্রাসঙ্গিকতা প্রতিদিন আরও বেশি করে অনুভূত হচ্ছে। ভারতবর্ষের আয়তন ক্রমশ কমতে কমতে ১৯৪৭-এ ভারত ত্রিধা বিভক্ত।

আবার কয়েকমাসের মধ্যেই ঘটল ভূস্বর্গে হানাদারদের অনুপ্রবেশ। তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্বের অদূরদর্শিতার ফলে আজও কাশ্মীরের বিশাল ভূভাগ শত্রুর কবলে। সেখানে আজ রমরম করে চলছে জঙ্গি জেহাদিদের প্রশিক্ষণ শিবির। সেই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জঙ্গিরা আঘাত হানছে ভারতের সীমান্তে, অভ্যন্তরে খোদ রাজধানীতে। এদেশের জল, বায়ু, অন্নে প্রতিপালিত পঞ্চম বাহিনী তাদেরকে আশ্রয়, প্রশ্রয় এবং নৈতিক সমর্থন প্রদান করছে, টার্গেটে এগিয়ে দিচ্ছে। কেউ ধরা পড়লে তার জন্য উকিল-মোক্তারদের কোনও কমতি নেই। যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব নিজেদেরকেই রক্ষা করতে পারে না, নিরাপত্তা রক্ষী ছাড়া জনসেবায় যেতে পারে না তারা কী করে সমাজকে রক্ষা করবে? এজন্য হিন্দু সমাজকে রক্ষার ব্যবস্থা হিন্দুসমাজকেই করতে হবে।

যুগাচার্যের দৃষ্টিতে হিন্দু মিলন মন্দির

"গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে এমন এক মিলন-ক্ষেত্র রচনা করিতে হইবে যেখানে উন্নত-অনুন্নত, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-নির্ধন সমস্ত হিন্দুই পরম প্রীতিভরে সম্মিলিত ও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া হিন্দু সমাজের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনে আত্মনিয়োগ করিতে পারিবে। আজ চাই এমন মিলনভূমি যেখানে হিন্দুমাত্রই পরস্পর ভেদাভেদ, দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘর্ষ, অনৈক্য-পার্থক্য বিস্মৃত হইয়া স্বীয় ধর্ম-মান-ইজ্জত-স্বার্থ ও অধিকার রক্ষায় দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে। এতদুদ্দেশ্যেই আমার 'হিন্দু মিলন মন্দির' আন্দোলন প্রবর্তন।"

আমাদের গণতন্ত্র ঃ সংস্কার সম্ভব ?

(৩ পাতার পর)

অপরপক্ষে, মার্কিন প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রপতি সরাসরি জনগণ দ্বারা অথবা জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা নির্বাচিত হন। তারপর তিনি তাঁর পছন্দমত লোকদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। সংসদ নির্বাচন আলাদাভাবে হয়, তার সঙ্গে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের কোনও সম্পর্ক নেই। মন্ত্রিসভার সদস্যরা সংসদের সদস্য নন, কিন্তু তাদের নিয়োগের ব্যাপারে সংসদের সম্মতি প্রয়োজন। রাষ্ট্রপতি নিজের মন্ত্রিসভা নিয়ে সরকার চালান, কিন্তু সংসদ তাঁর কাজের উপর লক্ষ্য রাখে, এবং প্রয়োজনে তাঁর কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রপতির কাজ চালানোর জন্য সংসদের আস্থা প্রয়োজন নেই, বরঞ্চ এমন প্রায়ই হয় যে রাষ্ট্রপতি এক দলের, আর অধিকাংশ সাংসদ অন্য দলের। শুধু তাই নয়, এই প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রপতির প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে তাঁকে গদিচ্যুত করা যায় না। করতে হলে সুদীর্ঘ 'ইমপিচমেন্ট' প্রক্রিয়া আরম্ভ করতে হয় এবং তা একমাত্র ব্যক্তিগত কোনও বিচ্যুতির কারণেই করা যায়।

এই মার্কিন প্রক্রিয়ায় কতকগুলো সুবিধা আছে। প্রথমত, যেহেতু রাষ্ট্রপতি ইচ্ছে মতো (সংসদের অনুমতি সাপেক্ষে) মন্ত্রিসভা নিয়োগ করতে পারেন, তাই তিনি প্রতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মানুষকে মন্ত্রিসভায় আনতে পারেন। বৃটিশ প্রক্রিয়ায় প্রতিটি মন্ত্রীকেই রাজনীতির লোক হতে হবে কারণ তাঁকে ভোটে দাঁড়িয়ে জিততে হবে, এবং তিনি নিজে মন্ত্রকের কাজ কিছু বুঝুন আর না বুঝুন, তাঁকেই চালাতে হবে। তাই আমাদের দেশে লালুর মতো রেলমন্ত্রী হন। বিশেষজ্ঞ মন্ত্রী হলে দপ্তরের কাজ যে ভাল চলবে সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই।

চলছে ভোটপর্ব

দ্বিতীয়ত, এই প্রক্রিয়ায় যদি সংসদে কোনও দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায় তাহলেও মন্ত্রিসভা গঠন করতে কোনও অসুবিধা হবে না, এবং সে মন্ত্রিসভা অন্য প্রক্রিয়ায় যেরকম নড়বড়ে অবস্থায় থাকে, সে ধরনের কোন সমস্যা থাকবে না। বৃটিশ প্রক্রিয়ায়, যদি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না হয় তা হলে যে ধরনের 'মিলিজুলি' সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় তা আমাদের সবারই জানা।

এই প্রবন্ধকারের নিবেদন, আজকে ভারতবর্ষের গণতন্ত্রে যে ধরনের বিকৃতি দেখা দিয়েছে তাতে এফ-পি-টি-পি থেকে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব, এবং বৃটিশ প্রক্রিয়া থেকে মার্কিন প্রক্রিয়ায় উত্তরণের প্রয়োজন ঘটেছে। আগামী বেশ কয়েক বছরে দেশে যেহেতু 'মিলিজুলি' সরকার হবে বলে সবাই ভবিষ্যৎবাণী করছেন, তাতে এই বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়েছে। এই বিষয়ে অন্তত একটা চিন্তাভাবনা শুরু হওয়া উচিত। এ রকম কথা যে আগে কেউ বলেননি তা নয়—কংগ্রেস নেতা বসন্ত সাঠে বহুদিন আগেই বলেছেন, অটলবিহারী বাজপেয়ীও এই ব্যাপারে একটা সর্বদলীয় উদ্যোগ নিয়েছিলেন, সোনিয়া মাইনো গান্ধীর অসহযোগিতার ফলে তা সম্ভব হয়নি। সেই পরিচ্ছেদ আবার আরম্ভ হওয়া উচিত।

গণতন্ত্রের নামে চলছে ফ্যাসিবাদী বর্বরতা

(৮ পাতার পর)

রাষ্ট্রীয় কাঠামোর 'you have a perfect Government for the Country, no ballot box, parliamentary eloquence, voting, constitution building or other machinery whatsoever can improve it a whit ?'—অর্থাৎ দেশের যথার্থ সরকার থাকবে, থাকবে না ভোটবাক্স, সংসদীয় বিতর্ক, সংবিধান প্রণয়ন বা রাষ্ট্রযন্ত্রের কণামাত্র উন্নয়নের সহায়ক প্রক্রিয়া। পশ্চিমবঙ্গে প্রকারান্তরে এই শাসন ব্যবস্থাই বামফ্রন্ট শাসনে কায়েম হয়েছে। সরকার নামক একটি দলীয় ব্যবস্থা আছে—যেখানে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায় জনগণ 'আমরা' এবং 'ওরা'য় বিভক্ত। ভোটবাক্স একরকম থেকেও নেই। কারণ, বাক্সটির ওপর অবাধে শাসকদলের বলাৎকার চলে, সংসদীয় বিতর্ক বিধানসভায় পক্ষপাতদুষ্ট নিয়ন্ত্রণে সংকুচিত, সাংবিধানিক কানুন তৈরী হয় চাষির জমি লুটে 'বৈদিক ভিলেজে'র মতো বিত্তবানদের প্রমোদ উদ্যান গড়ে তুলে, ঢালাও মদের দোকান খোলার অনুমোদন দিয়ে, শিক্ষা-সংহার করে, স্বাস্থ্যপরিষেবা নার্সিংহোমের লুঠতরাজের জন্য। সরকার জনগণের জন্য নয়, দলের স্বার্থরক্ষার জন্য এরাজ্যে তিন দশকের বেশি সময় ধরে রয়েছে। তাই পার্টির 'খুচরো কমরেডের' দাপটে প্রশাসন সর্বদা তটস্থ। এদের নির্দেশের বাইরে থানার বড়বাবুর পর্যন্ত হাত-পা নাড়ার স্বাধীনতা নেই। সাধারণের ডায়েরি পর্যন্ত এই কমরেডদের অনুমতি ছাড়া নেওয়া যায় না। সাংবিধানিক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান বিচারব্যবস্থাও আজ অসহায়। বিচারকের ভূমিকা অপছন্দের হলে দলের প্রধান হুঁশিয়ারী দিয়ে মিছিল পরিচালনা করে স্লোগান দেন, 'লালা তুই বাংলা ছেড়ে পালা'। পুলিশ প্রশাসনকে দলের স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ দেববাবু নন গেজেটেড পুলিশ কর্মচারিদের সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, 'আপনারা আপনাদের দায়িত্ব (দলদাসত্ব) নির্ভয়ে পালন করুন, হিউম্যান রাইটস্-ফিউম্যান রাইটস্ আমি দেখে নেব'। নির্বাচন পরিচালকদের পর্যন্ত কিছুদিন আগে এদের প্রয়াত নেতা যিনি মরা মানুষ বাঁচানো ছাড়া আর সবই পারতেন তিনি কুৎসিত ভাবে শাসিয়ে বলেছেন, 'বেশি বাড়াবাড়ি করবেন না। নির্বাচনের পরে আমরাই থাকব। তখন আমাদের পায়ে ধরতে হবে।' এই হচ্ছে এ রাজ্যে শাসক সি পি এমের সংসদীয় গণতন্ত্র এবং সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন। এইভাবেই হিটলার-মুসলিনির ফ্যাসিবাদী ভূত এদের ঘাড়ে চেপে বসে গণতন্ত্রের টুঁটি টিপে বসে আছে তিন দশকের বেশি সময় ধরে।

শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেশের পরম্পরা বা ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির উপরও চলছে ফ্যাসিস্ট কায়দায় নিয়ন্ত্রণ। তাই সরকার (জ্যোতি বসুর মুখ্যমন্ত্রীত্বকালে) সংস্কৃত পঠন-পাঠন উঠিয়ে দিয়ে দেশের শিষ্টসাহিত্য-সংস্কৃতি ও জীবনাচরণের পরিশীলিত পরম্পরা থেকে এ রাজ্যের নতুন প্রজন্মকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। কেবল সংস্কৃত পঠন-পাঠনই নয়, বাংলা শব্দ এবং বানানবিধির ওপরেও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বলাৎকার শুরু হল এই দশকে।

ডিগ্রি ভাঁড়ানো বিদ্যাদিগ্‌গজ পবিত্র সরকারের নতুন ব্যাকরণবিধির দৌরাত্ম্য শুরু হলো সরকারি অনুমোদনে 'বাঙলা অ্যাকাডেমি'র প্রসবাগার থেকে। 'বিদ্যাসাগর বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথে'র সাধুগদ্যের চলিত রূপান্তরের নৈরাজ্য সৃষ্টির নির্দেশিকা ঘোষিত হলো স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ রচনায়। এইভাবে শিষ্টসাহিত্যের ঐতিহ্য ধ্বংস করার প্রক্রিয়া ফ্যাসিস্ট আচরণের সঙ্গেই সঙ্গতিপূর্ণ। সরকার-পোষিত তথাকথিত স্বয়ংশাসিত মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ অনুমোদিত 'কিশলয়' পাঠ্যপুস্তকে 'ছৌনাচে'র বর্ণনায় গণেশ বন্দনা আছে বলে ওই অংশ বাদ দিয়ে সরকার অনুমোদিত অভিনব 'ছৌনাচ' পাঠ্য করা হল। এই দুঃশাসন যদি থাকে তাহলে কালে দেখা যাবে ধর্মপ্রধান প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সহ রবীন্দ্রনাথের 'পূজা' পর্যায়ের গান ও কবিতা বাতিলের পর্যায়ে চলে গেছে। 'সংস্কৃতি ও সাহিত্যে'র ওপর এ জাতীয় আক্রমণ ফ্যাসিস্ট সরকারের চেহারাকেই স্পষ্ট করে।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোর অন্যতম প্রধান স্তম্ভ সংবাদ মাধ্যম ও অ-শাসকদলের ফ্যাসিস্ট কায়দায় অনেকটা নিয়ন্ত্রিত এবং বিরোধী মাধ্যম নানাভাবে আক্রান্ত। তাই কোথাও চবিবশ ঘণ্টা সরকারের নামকীর্তন চলছে আবার কোথাও সরকারের আনন্দ সংবাদ পরিবেশিত হচ্ছে।

সর্বোপরি 'right to information' অর্থাৎ তথ্য জানার অধিকারের ওপরও সরকারের নিয়ন্ত্রণ, তথ্য- নিখোঁজ এবং অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা এ রাজ্যের জনচেতনাকে অন্ধকারে আবদ্ধ রাখছে। তাই সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ডের নথি আজ নিখোঁজ, বামফ্রন্ট সরকারের রাজত্বে গঠিত হরতোষ চক্রবর্তী কমিশন, শর্মা-সরকার কমিশন, অজয় দে কমিশন-এর রিপোর্ট আজও দিনের আলো দেখল না। এইভাবেই ফ্যাসিবাদী সিপিএমের কবলে এ রাজ্যের গণতন্ত্র আজ বিপন্ন।

গুজরাট সরকারের পদক্ষেপ অভিনন্দনযোগ্য

(৮ পাতার পর)

সম্মতিতে রাজ্য সরকার গঠন করবে। এই সংস্থার তদন্তে অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে, সংশ্লিষ্ট নির্বাচিত প্রতিনিধিকে অপসারণের ক্ষমতা নিশ্চয়ই জেলাশাসকের থাকবে।

ভোটদান শুধু বাধ্যতামূলক করলে চলবে না। ভোটাররা যাতে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিতে পারেন, তা প্রশাসনকে সুনিশ্চিত করতে হবে।

অভিযোগ, কিছু রাজ্যে উচ্চবর্ণের লোকরা হরিজন ও অন্যান্য নিম্নবর্ণের লোকদের ভোট দিতে বাধা দিয়ে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গে বহু অঞ্চলে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, বিরোধী দলের সমর্থক ও কর্মীদের শাসকদলের কর্মীরা প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতে ভোট কেন্দ্রে যেতে দেন না। এই অভিযোগ পুরোপুরি সত্য।

নানা অসুবিধা সত্ত্বেও নির্বাচনী সংস্কারের ক্ষেত্রে গুজরাট সরকারের পদক্ষেপ অভিনন্দনযোগ্য।

Swastika
1 February - 2010, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12

নাগপুরে বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রার সমাপ্তি

নাগপুরে বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রার সমাপ্তি সভার মঞ্চ।

গো-রক্ষায় বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক

বিশেষ প্রতিনিধি।। ১০৮ দিন ব্যাপী বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রা ১৭ জানুয়ারি বিকালে নাগপুর স্থিত রেশমবাগ ময়দানে এসে উপস্থিত হয়। গো-রক্ষা, প্রকৃতি-রক্ষা এবং ভারতীয় গ্রামসমূহকে রক্ষার অঙ্গীকার করেই শেষ হলো বিশ্ব-মঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রা। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অগণিত সাধু-সন্ন্যাসীরা এতে যোগদান করেছিলেন এবং এই সমারোপ কার্যক্রম থেকেই তাঁরা সমস্বরে দাবী তুললেন—অবিলম্বে গো-হত্যা বন্ধে আইন-প্রণয়ন করতে হবে। মোক্ষম কথাটি বললেন শঙ্করাচার্য স্বামী রাঘবেশ্বর ভারতী। তাঁর কথায়—"এই উদ্‌যাপন (অর্থাৎ সমারোপ অনুষ্ঠান) আগামীদিনে এনিয়ে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের বার্তা ঘোষণা করছে।" বিশ্ব-মঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রার একদম অন্তিমে এসে 'চুম্বকে' উঠে এল এটুকুই। এর আগে গত ৩০ সেপ্টেম্বর কুরুক্ষেত্র থেকে এই যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং সারাদেশে ২০ হাজার কি.মি.পথ পরিক্রমা করে দেশজুড়ে গো-সম্পদকে কেন্দ্র করে জনজাগরণের কাজ করে। রেশমবাগ ময়দানে বিশাল মঞ্চে বিভিন্ন মঠ, মন্দির, পন্থের সাধু-সন্ত, শংকরাচার্য, মৌলানা এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের পূজ্য সরসংঘচালক মোহনজী উপস্থিত ছিলেন। এই সভার অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য- এই সভার সভাপতি হিসাবে ছিলেন বাপ্পাস্বামী নন্দী নামে অভিহিত একটি ষাঁড়। যে প্রায় ৫ ঘণ্টা একটানা মঞ্চে দাড়িয়েছিল।

জৈনমুনি পবিত্রসাগর মহারাজ বলেন, ২৪ তীর্থংকরের পূর্বে আদিনাথ মহারাজ ছিলেন যার চিহ্ন ছিল গাই এবং জৈন সাধুদের ভিক্ষাকে বলা হয় গৌচরি বৃত্তি। তিনি গাই সংরক্ষণের চেয়ে সংবর্দ্ধনের উপর জোর দেন। তিনি প্রত্যেকের বাড়ীতে একটি গাই রাখার জন্য বলেন। যোগগুরু বাবা রামদেব বলেন, ১৭৬০ সালের আগে এদেশে কোনও কসাইখানা ছিল না। ইংরেজরা আসার পর কসাইখানা চালু এবং গোমাংস ভক্ষণের প্রয়াস চালায়।

পূজনীয় মোহন ভাগবত বলেন, গ্রামের বিকাশের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের বিকাশ সম্ভব এবং দেশী গাই শুধুমাত্র কৃষি ও কৃষককে বাঁচাতে পারে। মুসলিম ধর্মাচার্য তৈয়র কুরেশী বলেন, এই আন্দোলনে লক্ষ লক্ষ মুসলিম সই করেছে। প্রয়োজনে গো-হত্যা বন্ধের দাবীতে গুলি বুক পেতে নেবার জন্য লক্ষ লক্ষ মুসলিম তৈরি। মৌলানা বসির কাদরী বলেন, ছত্তিশগড়ে রাজ্যে কোন গাই কাটা হয় না। তিনি বলেন, সরকারের কাছে অনুরোধ নয়—সরকারকে বাধ্য করাতে হবে। পূজ্য রাঘবেশ্বর ভারতী বলেন, সংঘের মধ্যে মমতা এবং ক্ষমতা দুইই আছে। সংঘশক্তির মাধ্যমে এই আন্দোলন সফল হতে পারে।

সভার শুরুতে সংস্কার ভারতীর গান এবং নাচের অনুষ্ঠান হয়। আগামী ৩১ জানুয়ারী দিল্লীতে রাষ্ট্রপতির হাতে সংগৃহীত হস্তাক্ষর জমা দেওয়া হবে।

১৭ জানুয়ারি সভা শেষে ১৮, ১৯ জানুয়ারি দুদিনের একটি সর্বভারতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় যেখানে উত্তরবঙ্গ প্রান্ত থেকে গৌতম সরকার এবং দক্ষিণবঙ্গ থেকে শংকর মিত্র উপস্থিত ছিলেন।

শহীদ মিনারের সমাবেশে জনতার একাংশ।

বাঁধ ভাঙ্গা অফুরান খুশিতে আপনাকে মাতিয়ে দিতে
বিনোদনের হরেক পসরা সাজিয়ে আসছে বেসিল

BIL
BASIL
INTERNATIONAL LIMITED
আপনার স্বপ্নের নতুন ঠিকানা

Divisional Office : Raghunath Niwas, 1st floor, Karunamoyee Housing Complex
Sen Raleieh Road ; Asansol - 4, West Bengal
Corporate Office : B-1343, Indira Nagar, Lucknow - 226016
Area office :- Mechada , Purba Medinipur
Branch Office :- Contai,Belda ,Ghatal,Nimtouri,
Kakdwip,Jhargram,Balasore,Rairangpur,Baripada,
Bhadrak,Cuttak,Jharsugda,Lohardaga

TRAVEL, TOURISM & CULTURAL DIVISION

প্রকাশিত হবে ৮ই ফেব্রুয়ারি '১০ স্বস্তিকা প্রকাশিত হবে ৮ই ফেব্রুয়ারি '১০

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

মহাবীর কিন্তু মহারাজ নন। তবু তিনিই কোচবিহার রাজ পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু। সততা, মূল্যবোধ, যুদ্ধবিদ্যা এবং সাহিত্য সংস্কৃতিতে যিনি উত্তরবঙ্গের শিবাজী নামে খ্যাত। কোচ সেনাপতি বীর চিলা রায়ের পাঁচশত বছরের প্রেক্ষিতে আগামী সংখ্যার বিশেষ বিষয় – বীর চিলা রায়।

।। নিয়মিত আকারেই প্রকাশিত হবে।। দাম একই থাকছে।। সত্বর কপি বুক করুন

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, সহ সম্পাদক ঃ বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com